হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

পূজা সংখ্যা আশ্বিন, ১৪২৩, অক্টোবর ২০১৬

"All Men are Struggling through Paths which in the end lead to Me"

Quoted by Swami Vevekanand
at Chicago on 11 September, 1893

With Best Compliments from :-

Prafull Goradia, Delhi

হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

সাহস ✪ শক্তি ✪ সক্রিয়তা

বিশেষ পূজা সংখ্যা ২০১৬ (আশ্বিন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ)

সম্পাদক
সমীর গুহরায়

প্রকাশক ও মুদ্রক
তপন কুমার ঘোষ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা-৭০০০১২
ফোন ঃ ৭৪০৭৮১৮৬৮৬

মুদ্রণে
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন ঃ ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬

প্রাপ্তিস্থান
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য-১৬ টাকা

ইন্টারনেটে হিন্দুসংহতি
<www.hindusamhati.net>,
<hindusamhatibangla.com>
<www.hindusamhatitv.blogspot.in>,
Email : hindusamhati@gmail.com

সূচীপত্র

আমাদের কথা		২
সহজ সত্যকে অস্বীকার করা হিন্দুর জাতীয় রোগ	তপন কুমার ঘোষ	৩
বাঙালির বাহুবল ও বাঙালির বৈষ্ণব ধর্ম - পরস্পরবিরোধী?	ডঃ তমাল দাশগুপ্ত	৬
এই লড়াইয়ের বীজ মন্ত্র	দেবতনু ভট্টাচার্য্য	১৫
আদিনা মসজিদ কি সত্যিই মসজিদ?	ইন্দ্রজিৎ	১৬
পরাভূত জাতির মহানায়ক	অমিত মালী	২১
সিরিয়ার ক্যাম্পের সেই মেয়েটি	দেবশ্রী চক্রবর্তী	২৫
সবুজ আলো	সংগৃহীত	২৮
ভ্যান রিক্সা	ডাঃ অরুণ কুমার গিরি	৩২
ডুয়েল	অম্বিকা গুহরায়	৩৩
বিস্মৃত এক ভারতরত্ন ঃ রবীন্দর কৌশিক —"দ্য ব্ল্যাক টাইগার অফ ইন্ডিয়া"	রাজা দেবনাথ	৩৭
বুদ্ধির পরীক্ষা	সমীর গুহরায়	৩৯
পত্রিকা দপ্তর থেকে		৪১

কবিতা

পুজো তো আসে না	দ্বৈতা হাজরা	২৩
জীবনযুদ্ধ	সুন্দর গোপাল দাস	২৩
আগমনী	সমীর গুহরায়	২৪
অলিম্পিকে দীপা	মদন সিংহ	২৪
ক্লেদাক্ত জীবন	ময়ূখ ব্যানার্জী	২৪

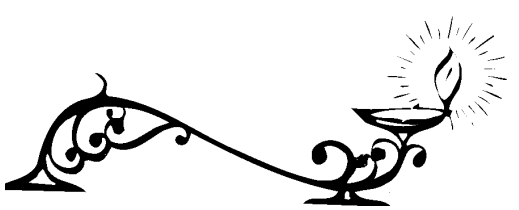

আমাদের কথা

যুদ্ধং দেহি

প্রতি বছর আসেন। এবারও আসছেন। মা দুর্গা আসছেন। কিন্তু কোথায় আসছেন মা? আসার হেতুই বা কী? আপামর বাঙালিকে জিজ্ঞাসা করুন, উত্তর আসবে- মা আসছেন তাঁর বাপের বাড়ি। প্রতিবছর এইসময় তো মা দুর্গা তাঁর বাপের বাড়িতে আসেন। 'ভক্তের আকুতি'-র আগমনী গান শোনেননি? মেনকার উচ্ছ্বাস-উৎকণ্ঠা, গিরিরাজের ব্যাকুলতা, কখন কন্যা উমা আসবে ঘরে। পড়েন নি? মায়ের স্নেহ মাখানো উষ্ণ কোল তো স্বর্গসুখের চেয়েও বেশি। কন্যাকে বুকে জড়িয়ে তার ললাটে স্নেহ চুম্বন এঁকে দেওয়া তো স্বর্গ সুখের চেয়েও বেশি। তাই শাক্ত কবিরাও কাঁদতে কাঁদতে মা-মেয়ের মিলন দৃশ্য নিয়ে রচনা করলেন অজস্র গান।

মা দুর্গার মর্ত্যে আগমনের এটাই কি প্রধান হেতু? তবে তিনি কেন এমন 'যুদ্ধং দেহি' বেশে রণসাজে সজ্জিত হয়ে এলেন। কার্তিক-গণেশ পুত্রদ্বয়ও তো রণসাজে সজ্জিত! কারণ মা দুর্গা আসছেন অসুর দলন করতে। মহিষাসুর পাপে ক্লিষ্ট ধরাধামকে অত্যাচার, বঞ্চনা, শোষণের হাত থেকে মুক্তি দিতে। অধর্মের বিনাশ ঘটিয়ে ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে। অসুর অহংকারী। নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করেন। অস্ত্রের শক্তিতে সারা বিশ্বকে শাসন করতে চায়। তাই তাকে সাধুবচনে তুষ্ট করা অসম্ভব। মা দুর্গা এই সত্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই অস্ত্রের জবাব তিনি অস্ত্র দিয়েই দিলেন। কোন মন্ত্রণালয় নয়, রণাঙ্গণে ভীষণারূপে আবির্ভূত হলেন মহিষাসুরের সামনে। যুদ্ধে ওই অসুরকে বধ করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। সাধুজনকে পরিত্রাণ করলেন। সত্য ধর্মকে পুনঃস্থাপন করলেন। এটাই ছিল দেবী মা দুর্গার মর্ত্য আগমনের প্রধান কারণ। অথচ শাক্ত কবিরা ভক্তিরসে গদ্‌গদ্ হয়ে মা-মেয়ের মিলন-বিরহের গান রচনায় ব্রতী হলেন। রৌদ্ররস, বীররস তাঁদের কবিতায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হল। সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক চাহিদাকে তাঁরা এড়িয়ে গেলেন। আর আপাত নিরীহ শান্তিপ্রিয় বাঙালি দীর্ঘ প্রবাসের পর নদীর উৎসে ফেরার মতো বৎসরান্তে কন্যার একবার বাপের বাড়ি আসার কাহিনী বলেই দুর্গার মর্ত্যে আগমনকে জানল। তাই কত আনন্দ, কত আলোর ঝলকানি এবং শেষে চোখের জলে বিদায়। ব্যাস্ বাঙালির দুর্গা বন্দনা শেষ।

কিন্তু শান্তি কি এত সহজে মেলে? সামান্য একটা লজেন্সও তো মূল্য দিয়ে কিনতে হয়। আর আমরা 'শান্তি'টাও কোন ত্যাগ স্বীকার না করে ফোকটে পাওয়ার জন্য লালায়িত। তাই বোধ হয় বাঙালিকে এত চরম মূল্য দিতে হয়েছে। ভারতের আর কোন জাতিকে বাঙালির মতো বিদেশী শাসকের এত অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি। তার কারণ অত্যাচারিত হয়েও আমরা তেমনভাবে প্রতিবাদী হইনি। প্রতিকারের পথে হাঁটিনি। মা দুর্গার পূজা করেছি, কিন্তু তাঁর মতো 'যুদ্ধং দেহি' মূর্তি ধরে অসুর দলনে অস্ত্র হাতে তুলে নিইনি। ফলও পেয়েছি হাতেনাতে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ। তবু বাঙালির চোখ খুলল না, এটাই আশ্চর্যের।

সহজ সত্যকে অস্বীকার করা হিন্দুর জাতীয় রোগ

তপন কুমার ঘোষ

সহজ সত্যকে স্বীকার না করা পৃথিবীর আর কোন দেশের মানুষের স্বভাব আছে কিনা জানিনা, কিন্তু ভারতের হিন্দুদের আছে। অর্থাৎ চোখের সামনে সবসময়ে যা দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে তাকেও স্বীকার না করা। গোটা পৃথিবীতে মুসলমান এবং অমুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক কেমন তা না জানা থাকলেও, ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক কেমন তা না জানার, না বোঝার কোন কারণ আছে কি? হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করে। আমাদের মতো সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদীরা গিয়ে খোঁচাখুঁচি না করলে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করে কি? তাহলে কলকাতার পার্ক সার্কাস ক্রমেই হিন্দুশূন্য হয়ে যাচ্ছে কেন? এটা কি কলকাতার মানুষের চোখে পড়ে না বা জানা নেই? আমাদের পাশেই বাংলাদেশে ক্রমাগত হিন্দু নির্যাতন ও পরিণামে হিন্দু পলায়ন, এটাও কি শুধু হিন্দু বা মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তির উসকানির পরিণাম? যে কোন হিন্দু, যে কেনার জন্য বা ভাড়া নেওয়ার জন্য একটা বাড়ি খুঁজছে, সে মুসলমান পাড়ায় গিয়ে বাড়ি নিতে চাইবে কি? হিন্দুদের বড় উৎসব দুর্গাপূজায় (যেখানে ধর্মের অনুসঙ্গ খুবই কম থাকে, আর শিল্প সংস্কৃতি হৈ-হুল্লোড় খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি অনেক বেশি পরিমাণে থাকে) প্রতিবেশী মুসলমানরা কতটুকু অংশ গ্রহণ করে? আর মুসলমানের কয়েকটি বড় বড় উৎসবে যেমন ইদুজ্জোহা, ইদুলফিতর, সবেবরাত ইত্যাদি অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী হিন্দুরা কতটুকু অংশগ্রহণ করে? বহু পীরের মাজারে হিন্দুরা গিয়ে ধূপকাঠি জ্বালায়, কিন্তু কোন সন্ন্যাসীর সমাধিতে গিয়ে কোন মুসলমানকে শ্রদ্ধা জানাতে দেখেছেন কি? আমি সুন্দরবন অঞ্চলে অনেক ঘুরেছি। বহু জায়গায় বনবিবির মূর্তি ও মন্দির দেখেছি। শহরে প্রচলিত ধারণা যে বনবিবির মন্দিরে, যারা মধু সংগ্রহে গভীর জঙ্গলে যায় যেখানে বাঘের ভয় আছে, সেই হিন্দু ও মুসলমানরা উভয়েই পূজা দেয়। কিন্তু এই প্রচলিত ধারণা একেবারেই ভুল। সুন্দরবনের গায়ে বহু হিন্দু গ্রাম আছে, মুসলিম গ্রাম আছে ও হিন্দু-মুসলিম মিশ্র গ্রামও আছে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, যে কোন একটি পুরোপুরি মুসলিম গ্রাম বা মুসলিম পাড়ায় বনবিবির মন্দির বা মূর্তি এবং মুসলমানদের দ্বারা সেখানে পূজা দেওয়া দেখিয়ে দিন। কেউ পারবে না। শুধুই হিন্দু গ্রামে বা হিন্দু পাড়ায় বনবিবির মন্দির বা মূর্তি এবং তাতে পুজো দেওয়া দেখা যাবে। অর্থাৎ ঐ দেবী কার্যত শুধুই হিন্দুদের দেবতা। তাহলে তার নাম বনবিবি কেন? সহজভাবেই তো তার নাম বনদেবী হওয়া উচিৎ ছিল! তা হল না, কারণ হিন্দু মুসলমান মিলনের সমস্ত দায় হিন্দুকে একা বহন করতে হবে। তাই দেবীকে বিবি বানাতে হবে। কিন্তু তা বানিয়েও কি মিলন হল? সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রামগুলিতে গিয়ে দেখে আসুন, সম্পূর্ণ অন্য চিত্র দেখতে পাবেন।

সুতরাং এই সহজ সত্য, যা কলকাতার পার্ক সার্কাস, মেটিয়াব্রুজ থেকে শুরু করে সুন্দরবনের জঙ্গল পর্যন্ত দেখা যায়, তাকে স্বীকার না করা একটা মহারোগ। এই রোগেরই পরিণাম আমরা সবসময়ে ভুগছি। জাতীয় স্তরে এই রোগের পরিণাম হল, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর দুই দেশে হিন্দু-মুসলিম জনবিনিময় না করা। আর ক্ষুদ্র পরিসরে-গোটা দেশে গ্রামে গ্রামে, শহরের মিশ্র এলাকায় এর পরিণাম আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই হিন্দু-মুসলিম মিশ্র এলাকায় কি দুর্গাপূজার বিসর্জনে, কি মহরমের মিছিলে পুলিশকে এত সতর্ক ও তটস্থ থাকতে হয়।

দেশ বিভাগের পূর্বে অসংখ্য দাঙ্গা, দেশ বিভাগের সময় গণহত্যা, এমনকি দেশ বিভাগের পরও সারা ভারতে যত বড় বড় দাঙ্গা হয়েছে- তার খবর কি কেউ জানেনা? ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের 'হজরতবাল মসজিদ' থেকে মহম্মদের চুল চুরি যাওয়ার গুজবে বা অজুহাতে গোটা ভারতে ভয়ংকর দাঙ্গা হল। আমি ছোট বেলায় বাড়ির ছাদ থেকে কলকাতায় সেই দাঙ্গার আগুন দেখেছি। সেই অহেতুক দাঙ্গার কথা বয়স্ক মানুষেরা কি ভুলে গিয়েছেন? নাকি জোর করে ভুলতে চেয়েছেন?

এই সহজ সত্যকে আমরা স্বীকার করি না বলেই ইতিহাসের কিছু সহজ সত্য আমরা দেখতে পাই না। নেশন্‌স্টেট-এর কনসেপ্ট বা অবধারণা খুব বেশি পুরানো নয়। তার আগে রাজ্য নির্ধারিত হত রাজাদের জয় বা পরাজয়ের উপর ভিত্তি করে। তাই রাজ্যের ভাঙা-গড়া বা সীমানা পাল্টানো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ইউরোপে এই সেদিন পর্যন্ত বহু দেশের বা রাজ্যের ভাঙা গড়া হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে ভারতেও রাজাদের জয় পরাজয়ের দ্বারা রাজ্যের সীমা নির্ধারিত হত। কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার যে মানচিত্র আমরা দেখি, তাতে দেশগুলির যে সীমানা আমরা দেখি তা কিন্তু শুধু রাজাদের জয়-পরাজয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়নি। তা নির্ধারিত হয়েছে, আমাদের ধর্মের জয় পরাজয়ের দ্বারা। আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আগে ভারতেরই অঙ্গ ছিল। এই তিনটি দেশ আজ বিদেশে পরিণত হয়েছে শুধু ভারতের কোন রাজাদের পরাজয়ের জন্য নয়। তা যদি হত তাহলে সেখানে আমরা হিন্দুদেরকে দেখতে পেতাম। কিন্তু তা পাচ্ছিনা। অর্থাৎ ভারতের ঐ সকল অংশে আমাদের হিন্দু ধর্মের পরাজয় হয়েছে। তাই প্রাচীন অখণ্ড ভারতের ঐ অংশগুলি আজ শুধু বিদেশী রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি, তা আজ হিন্দুশূন্য হয়েছে।

সুদূর আফগানিস্তান বা বালুচিস্তান বা সিন্ধপ্রদেশ হিন্দুশূন্য হওয়া আর কলকাতার পার্ক সার্কাস হিন্দুশূন্য হওয়া- এর মধ্যে কোন মিল কি দেখা যায় না? সুসভ্য সুশিক্ষিত ও সুশীল মানুষরা দেখতে পান না, আমি দেখতে পাই। সেই মিলটা কী? সেই মিলটা হচ্ছে, হিন্দু আর মুসলমান পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করতে পারেনা। কেন পারে না সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দরকার আছে কি? সুশীল সভ্য মানুষরা মনে করেন দরকার নেই। আমি মনে করি দরকার আছে। এই প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেলে বিশাল ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান বর্তমানে যতটা ছোট হয়েছে, সেটুকুতেই থেমে থাকবে না, আরও ছোট হতে থাকবে। আমার এই কথাটা খুবই অসম্ভব, অবাস্তব ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বলে মনে হচ্ছে কি? তাই যদি হয় তাহলে স্বাধীন ভারতেও কাশ্মীরে আজ হিন্দু থাকতে পারে না কেন? পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বড় অংশ নিয়ে 'গ্রেটার বাংলাদেশে'র আওয়াজ শোনা যায় কেন? ভারতের মুসলিম প্রধান এলাকাগুলিতে হিন্দুকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় কেন? আর তারই প্রতিক্রিয়ায় উত্তরপ্রদেশে মুজফফর নগরে অথবা আসামের বোড়োল্যান্ডে মুসলমানকে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় কেন?

যে সহজ সত্যের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই সহজ সত্যটা হচ্ছে এই যে ৭১১ সালে হিন্দু রাজা দাহিরের রাজ্য সিন্ধের উপর মহম্মদ বিন কাশেমের আক্রমণ থেকে আজ পর্যন্ত এগারো'শ বছরের ইতিহাসের যে সময়টা, তার মোট ফল হল-হিন্দুসমাজ তার মাটি হারিয়েছে, মানুষ হারিয়েছে (হত্যা ও ধর্মান্তকরণ), সম্মান হারিয়েছে। এইসব হারানোর পরেও কি সেই পর্বটা (হারানোর পর্ব) সমাপ্ত হয়েছে? একটু চোখ কান খোলা রাখলে দেখতে পাবেন, সেই পর্বটা সমাপ্ত হয়নি। এখনও চলছে। এই পর্বটাকে অন্যরা যে নামেই অভিহিত করুন না কেন, আমি বলব এটা যুদ্ধ পর্ব। সেই যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি, এখনও চলছে। সুতরাং এটাও বুঝতে হবে যে, যুদ্ধ যখন চলছে তখন চূড়ান্ত জয় বা পরাজয় কারো হয়নি। অর্থাৎ হিন্দু জাতি অনেক কিছু হারিয়েছে, কিন্তু চূড়ান্ত পরাজয় এখনও মেনে নেয়নি। সেটুকুই আশা। তা না হলে আজ ভারত সিরিয়া বা ইরাক হয়ে যেতে পারত। তা হয়নি।

কিন্তু সমস্যাটা হল এই যে আমরা যুদ্ধাবস্থায় আছি এটা সমাজ স্বীকার করে কি? করে এবং করে না। যারা মুসলমানের জ্বালায় জ্বলছে তারা স্বীকার করে। কিন্তু শহরের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি অংশ স্বীকার করে না। কিন্তু তারাই তো সমাজের মস্তিষ্ক! সেই মস্তিষ্ক স্বীকার না করলে এই যুদ্ধাবস্থা বাকি সমাজও বুঝতে পারেনা। ফলে মুসলিমের জ্বালায় যারা জ্বলছে তারা মনে করে যে এটা তাদের স্থানীয় সমস্যা মাত্র। তাই তারাও বৃহত্তর হিন্দুসমাজের সহযোগিতা আশা করেনা। ফলে সুদীর্ঘ এগারো'শ বছরের যুদ্ধ চলতেই থাকে। হিন্দু তার মাটি, মানুষ ও সম্মান হারাতেই থাকে।

তাই আজকে সেই যুদ্ধের স্বীকৃতি চাই। সমাজের মস্তিষ্কের সাথে বাকি বৃহত্তর সমাজের যে ডিস্‌কানেক্ট আছে তা দূর করতেই হবে। সমাজ মস্তিষ্ক ও সমাজ শরীরকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সে দায়িত্ব সমাজ মস্তিষ্কেরই

বেশি। অর্থাৎ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি শ্রেণিকে এই এগারো'শ বছর ব্যাপী চলা যুদ্ধকে স্বীকার করতে হবে। তবেই দেশের এই সীমানা ছোট হওয়া ও সমাজের হিন্দুর অনুপাত/ শতাংশ কমা রোখা যাবে। কিন্তু ওই যুদ্ধকে অস্বীকার করলে তা রোখা যাবে না।

আমি বারবার বলেছি হিন্দু সমাজ ভীতু নয়, কাপুরুষ নয়। একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, হিন্দুসমাজের বহু গোষ্ঠী অত্যন্ত সাহসী ও দুর্ধর্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দুসমাজকে দুর্বল ও ভীরু বলে মনে হয়। তার কারণ কী? তার একমাত্র কারণ হল হিন্দু সমাজের মস্তিষ্কের (উচ্চ শ্রেণির) সঙ্গে বাকি বৃহত্তর সমাজের ডিস্‌কানেক্ট, যাদের মধ্যে আছে এই সাহসী গোষ্ঠীগুলি। একেবারে উত্তর ভারতের কথা ধরা যাক। জাঠ, রাজপুত, ডোগরা,গুজ্জর, যাদব, খটিক, বাল্মীকি- সবগুলিই অত্যন্ত সাহসী গোষ্ঠী, সবাই জানে। কিন্তু উত্তর ভারতের নেতা বললেই চোখে ভেসে ওঠে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নাম, যিনি ছিলেন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ, চরম ভীতু ও কাপুরুষ। তিনি ইংলন্ড, আমেরিকা ও রাশিয়ার ইতিহাস, ভূগোল ও সমাজশাস্ত্র যতটা জানতেন, তার সিকিভাগও উত্তর ভারতের এই সাহসী জনগোষ্ঠীগুলির কথা জানতেন না। এরই নাম ডিস্‌কানেক্ট। এরকম শুধু উত্তর ভারত নয়, গোটা ভারতের একই পরিস্থিতি। পূর্ব ভারতের কথা আমি খুব ভালো করে জানি। এখানেও সাহসী গোষ্ঠীর অভাব নেই বরং সাহসী গোষ্ঠীতে ভরপুর। একটা ছোট্ট উদাহরণই যথেষ্ঠ। ১৯৮৩ সালে আসামে নেলি-তে একটি ছোট্ট হিন্দু জনগোষ্ঠী তিন হাজারের বেশি মুসলমানকে হত্যা করেছিল। আমাদের দুই বঙ্গের কথা আমি অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করেছি এবং কত সাহসী ও দুর্ধর্ষ জাতি আমাদের এই দুই বাংলায় আছে তা উল্লেখ করেছি।

সুতরাং, এগারো'শ বছর ধরে চলা যুদ্ধের স্বীকৃতি এবং নিজেদের ধর্ম ও সমাজকে বাঁচানোর জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া আজ যুগের প্রয়োজন। আর এই যুদ্ধে জেতার জন্য আমাদের সমাজের বর্তমানে পিছিয়ে পড়া যে সাহসী ও দুর্ধর্ষ গোষ্ঠী বা জাতিগুলি আছে, তাদেরকে যোদ্ধা বা ক্ষত্রিয়োর মর্যাদা দেওয়া- এটাই আজকের যুগধর্ম। এই যুগধর্ম যদি আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারি তাহলে আমরা বিজয়ী হব এবং ইতিহাসের মোড় অন্যদিকে ঘুরবে। না হলে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর যেহেতু সনাতন ধর্মের বিনাশ নেই তাই এই সনাতন হিন্দুধর্ম হয়তো রাশিয়া, আমেরিকা বা বিশ্বের অন্য ভূখন্ডে থাকবে, কিন্তু এখানে থাকবেনা।

পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্যের বিষয় সর্বধর্ম সমন্বয়ের সোল এজেন্ট এবং ডিষ্ট্রিবিউটার্স শুধু হিন্দুরাই। এই নির্বোধ প্রেরণা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে পর্যন্ত বিকৃত করে দেখাবার দুঃসাহস সৃষ্টি করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাস্তবিকপক্ষে পূর্বভারতে হিন্দুধর্ম রক্ষা করলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ চিকাগোয় গিয়ে বিশ্বের সামনে হিন্দুত্বের বিজয় পতাকা তুলে ধরলেন। সেই বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে হিন্দু নয় প্রমাণ করতে, সেক্যুলার সর্বধর্মসমন্বয়কারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন মহম্মদের বাণীর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন, যাতে কাফেরদের সম্পর্কে নিষ্ঠুর নির্দেশগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। জনৈক 'হাফিজ' এর সংকলন করেছেন। হিন্দুর টাকায় এগুলো বিভিন্ন ভাষায় ছেপে হিন্দুদের মধ্যেই বিতরণ করা হচ্ছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধ্য আছে জামাতে ইসলামী জাতীয় কোন মুসলিম ধর্মীয় সংস্থাকে দিয়ে গীতা, উপনিষদ কিংবা কথামৃতের প্রচার করানো? যদিও বইগুলো সকলের জন্যই লেখা, তা পারবেন না। আত্মসমর্পণ করতে হবে শুধু হিন্দুকে। ঐক্যের দায় শুধু হিন্দুর।—শিবপ্রসাদ রায়

বাঙালির বাহুবল ও বাঙালির বৈষ্ণব ধর্ম - পরস্পরবিরোধী?

ডঃ তমাল দাশগুপ্ত
(অধ্যাপক, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়)

১

শরৎচন্দ্রের বৈঠকী আড্ডার অনেকগুলো কাহিনী বিভিন্ন লেখকেরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। একবার নন্দীগ্রাম (হ্যাঁ, সেই নন্দীগ্রাম, তবে তখন বলা বাহুল্য বিখ্যাত নয়) থেকে এক ব্যক্তি এসেছেন শরৎচন্দ্রের কাছে, লেখা চাইতে বা সাহিত্য সভায় আমন্ত্রণ করতে বা এরকমই কোনও উপলক্ষ্যে। শরৎ তখন খ্যাতির মধ্যগগনে, চট করে তাঁর সম্মতি পাওয়া তখন মুশকিল। কিন্তু এ হেন শরৎচন্দ্র নাকি নন্দীগ্রাম শুনেই চমকে উঠে বলেছিলেন, বাপ রে, নন্দীগ্রাম, সে যে পরম বৈষ্ণবদের জায়গা হে! তোমরা তো সাঙ্ঘাতিক লোক! বৈঠকে উপস্থিত বাকিরা একটা গল্পের আভাস পেলেন। পরম বৈষ্ণব অথচ সাঙ্ঘাতিক, এ দুটো একসঙ্গে কেন? তাতে শরৎচন্দ্র ওঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। সেটার প্লটটা হল এরকম। ইংরেজ আমলের গোড়ার কথা। খুব অত্যাচারী একজন দারোগা ছিল নন্দীগ্রাম অঞ্চলে। সে যুগে পুলিশে বেশিরভাগই ছিল মুসলমান। এই যে একটা কথা বলা হয়, যে সিরাজের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ইংরেজরা নাকি সুবে বাংলা দিয়ে দিয়েছিল হিন্দুদের হাতে, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। আব্দুস শুকুরের লেখা 'বাংলার পুলিশ সেকাল একাল' পড়লে দেখবেন, প্রায় পুরো পুলিশ দপ্তরটা মধ্যযুগের মতই থেকে গেছিল মুসলমানদের হাতে ইংরেজ আমলেও। হিন্দুরা তাদের শিক্ষা দীক্ষা ব্যবসা বাণিজ্যের জোরে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছিলেন, এইমাত্র, এবং ইংরেজ বাংলার হিন্দুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাদের আটকানোর প্রয়োজন উনিশ শতকের শেষদিক (সুরেন ব্যানার্জিদের উত্থানের সময়)- এর আগে অনুভব করেনি, এইমাত্র। সে যাই হোক। কথা হল, দারোগাটি সম্ভবত মুসলমান (অনুমান ভুল হলে ক্ষমাপ্রার্থী), এবং অত্যাচারী। নন্দীগ্রামের লোকেরা পরম বৈষ্ণব। এখন সেই দারোগাটির রক্তপাত তো আর তারা হতে দিতে পারে না। তাই তারা কি করল, একদিন সালিশির নামে দারোগাটিকে ডাকল গ্রামের মধ্যে, দারোগাও বেশ কিছু আমদানির লোভে গিয়ে হাজির হলেন। এইবার গ্রামবাসীরা করল কি, তারা চারদিক থেকে ঘিরে ধরে দারোগাটিকে প্রথমে বেঁধে ফেলল এবং ঢুকিয়ে দিল একটা খড়ের গাদায়।

তারপর আর কি। সে খড়ের গাদায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল। ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন যাকে বলে।

এইবার কথা হচ্ছে, বাংলার বৈষ্ণবধর্ম কি বাঙালির বাহুবলের পরিপন্থী? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা এই প্রবন্ধে খুঁজব।

চৈতন্য আন্দোলনের প্রেক্ষিতে যদি দেখি, কাজীদলনের ব্যাপারটা কিন্তু খুব একটা অহিংস ছিল না। কাজীর বাড়িতে মার মার শব্দ করে চৈতন্যের অনুগামীরা ঢুকেছিলেন, ভাঙচুর করেছিলেন এবং সে সময় কাজী বলির পাঁঠার মত ঠকঠক করে কেঁপেছিল। কাজীর গায়ে হাত দিলে তখনই গৌড়ের সুলতানের সৈন্য আসত, কাজেই সেটা ওঁরা করেন নি। কিন্তু অত্যাচারিত হিন্দুরা সেই প্রথম সঙ্ঘশক্তি দেখিয়েছিল, অন্তত নথিবদ্ধ ইতিহাসে এটাই প্রথম উদাহরণ।

২

বাংলায় যে গুপ্ত তন্ত্রসাধনা দেখি, শাক্তমতে মূলত, সে সাধনার উৎস কবে, বলা যায় না। অনেকে মনে করেন সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার চিহ্নসমূহে তন্ত্রসাধনার ইঙ্গিত আছে। বাংলায় গুপ্ত সাধনপদ্ধতি, বজ্রযানী ও সহজযানী তন্ত্রসাধনা মূলত মাৎস্যন্যায় (শশাঙ্কের গৌড়তন্ত্রের অবলুপ্তির পরের অরাজক একশো বছর) যুগেই ছড়িয়েছিল এবং ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছিল, এমনটা মনে করার বেশ কয়েকটা কারণ আছে এবং আমি বাঙালির ইতিহাস নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে দেখেছি যে আজও সে জনপ্রিয়তা সমানভাবে বহমান। আমাদের তান্ত্রিকদের সাধনপদ্ধতি থেকে বাউলদের সাধনপদ্ধতি- সবই সেই প্রাচীন গুপ্ত ও গুহ্য সাধনার ধারা। প্রকাশ্য সাধনপদ্ধতি (যেমন দোল, বসন্তোৎসব, নবান্ন, চড়ক, গাজন) বাঙালি সমাজে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল, বিভিন্ন নথিতে তার উল্লেখ পাই। কিন্তু এই মাৎস্যন্যায়ের সময় অরাজকতা চলার ফলে সেরকম প্রকাশ্য উৎসব আয়োজন করা, সেখানে উপস্থিত মানুষের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেওয়া, প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এইজন্য অপ্রকাশ্য ধর্মাচরণের প্রবণতা এই সময় থেকে বাড়ে। এদিকে পালযুগে রাষ্ট্রের সহায়তা থাকার ফলে এই বৌদ্ধ বজ্রযানী ও সহজযানী গুহ্য সাধনা আরও শক্তিশালী হয়। আলো আঁধারি সন্ধ্যাভাষায় লেখা চর্যাপদে এর দার্শনিক প্রকাশ।

এরপরে মুসলমান আক্রমণের ফলে হল কি, এই গুহ্যসাধনা ছাড়া অন্যপ্রকার সাধনার উপায় আর প্রায় রইলই না। যেমন জয়দেবের সময় বা তারও আগে থেকেই কেঁদুলিতে মকর সংক্রান্তির মেলা বসত, সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

এর বেশ কয়েক শতক পরে, যখন মুসলমান আগ্রাসনের ধাক্কা সামলে উঠে বাঙালি প্রথমবার আবার সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে, তখনকার প্রধান ফসল চৈতন্য আন্দোলন। একটি পরাজিত জাতির সেই হতাশার কালরাত্রিতে মশাল হাতে মিছিল করতে চৈতন্যই শেখালেন। কিন্তু দেশময় চৈতন্যকে মূলতঃ এই গুহ্যসাধনায় অভ্যস্ত শাক্ত (ততদিনে বজ্রযান অবলুপ্ত হয়ে গেছে এবং মা তারা প্রমুখ বৌদ্ধ বজ্রযানী দেবতা শাক্তধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন) বাঙালিই বাধা দিয়েছিল। যেটা অনেকেই জানেন না, জগাই মাধাই ছিলেন শাক্ত। তাদের জয় করাটা চৈতন্য আন্দোলনের একটা মাইলস্টোন। চৈতন্য অনুসারীরা কেন জগাই মাধাই-এর সঙ্গে মারামারি না করে নিজেদের ডেরায় তুলে এনে এদেরকে বুঝিয়েছিলেন (কোনও নাটকীয় আচমকা পরিবর্তন ঘটেনি এদের, দীর্ঘ এক রাত আলাপ আলোচনা চলেছিল এদের সঙ্গে চৈতন্য ও পার্ষদদের, ইতিহাস বলছে) সেটা বোঝা দরকার। বোঝা দরকার যে মাতলামিরত জগাই মাধাইকে ক্ষমা করে নিত্যানন্দ কোনও কাপুরুষতা দেখান নি, সেটা একটা জরুরি স্ট্র্যাটেজি ছিল, এদেরকে দলে টানতে পারলে নবদ্বীপে বৈষ্ণব আন্দোলন শক্তিশালী হবে। হয়েছিলও।

৩

রাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। তাই বুঝতে হবে, বাংলায় যে গভীরভাবে প্রোথিত শক্তি-উপাসনা, বাংলার বৈষ্ণবধর্ম তার থেকে আলাদা কিছু নয়। বঙ্কিম বলে গিয়েছিলেন, বাংলার হিন্দুধর্মের শেকড় হল সাংখ্যে, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ দর্শনে। প্রকৃতির প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়ে কালীর পায়ের তলায় যে শিব শুয়ে আছেন বা গীতগোবিন্দের যে কৃষ্ণ দেহি পদপল্লবমুদারম বলছেন রাধাকে, দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও মনে করেন, তা বাংলার নিজস্ব হিন্দুধর্মের নির্যাস তুলে ধরে। এখানে প্রকৃতি অর্থে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যা মাতৃকাশক্তির প্রকাশ।

এখন মা কালীকে নিয়ে তেমন কোনও অভিযোগ না থাকলেও রাধাকে নিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের একাংশের প্রচুর অভিযোগ। বাংলাদেশে তো একদল হিন্দুত্ববাদী রাধাকে উচ্ছেদ করার জন্য আদাজল খেয়ে নেমেছেন ফেসবুকে, সে আমরা প্রায়ই দেখি।

সমস্যা হল, আমাদের পিঠ যখন দেওয়ালে ঠেকে যায়, তখন প্রায়শঃ অস্ত্র ভিন্ন অন্য কোনদিকে আমাদের নজর থাকে না। আজ যদি এরা বলতেন, রাধা কৃষ্ণকে কিছুদিন মুলতুবি রাখো, তার মানে তাও কষ্টে-সৃষ্টে বুঝতাম। কিন্তু হিন্দুধর্ম থেকে যারা বরাবরের মত চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মকে ও রাধাকৃষ্ণকে (বৈষ্ণব ধর্মের অনেক রকমফের আছে। এমনকি রাম আর হনুমানের পুজো যারা করে তারাও বৈষ্ণব, কারণ রামও বিষ্ণুর অবতার। আমি এখানে এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র বাঙালির নিজস্ব বৈষ্ণব ধর্মের কথাই বলছি) উচ্ছেদ করে ফেলতে চান, তারা যাতে একটু ভাবনাচিন্তা করেন, সেইজন্যই এই লেখায় হাত দিলাম।

প্রথমেই বোঝা দরকার, চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব মানে পরাজয়বাদী বা পলায়নবাদী নয়। হ্যাঁ, রক্তপাত সম্পর্কে তাঁদের কিছু ইনহিবিশন আছে। আপনারা জানেন এই একই কারণে বৌদ্ধ দেশগুলোতে একদা কারাটে, কুংফু, জুডো ইত্যাদি মার্শাল আর্ট সৃষ্টি হয়েছিল, কেননা ধারালো অস্ত্র হাতে না ধরেও, রক্তপাত না ঘটিয়েও যদি বিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়, তাহলে শ্যাম ও কূল দুইই রাখার চমৎকার ব্যবস্থা ঘটে। এবং এটা এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার নয়। সোভিয়েত রাশিয়ায় স্তালিনের পুলিশের প্রিয় গুপ্তহত্যার পদ্ধতি ছিল একধরণের বালিভর্তি থলে দিয়ে মাথার পেছনে আঘাত করা, এতে মস্তিষ্কের ভেতরে রক্তক্ষরণ ঘটে মৃত্যু হলেও বাইরে কোনও আঘাতের চিহ্ন থাকত না। রক্ত না ঝরিয়েই অভীষ্টে পৌঁছলে খারাপ কি। ওই নন্দীগ্রামের দারোগার কেস আর কি।

এদিকে চৈতন্য নিজে পাষণ্ডদলনের কথা বারবার বলে গেছেন। ঘোরের মধ্যে থাকলে তিনি ক্ষণে ক্ষণে ''ছিণ্ডো ছিণ্ডো পাষণ্ডীর মাথা'' বলে হুঙ্কার দিতেন। অসামান্য বলশালী এবং দীর্ঘদেহী ছিলেন তিনি, তিনি ও নিত্যানন্দ সেযুগের বাঙালির মুকুটহীন রাজা ছিলেন (একটা প্রবাদ চালু ছিল ''হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হল শ্রীচৈতন্য।'' নিত্যানন্দ পুরো বৈষ্ণবসমাজকে এক করেছিলেন, একটা অর্গানাইজড স্ট্রাকচার দিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁর গুরুত্ব কখনও কখনও চৈতন্যকেও ছাপিয়ে যায়)।

এদিকে ভক্তদ্রোহী (অর্থাৎ বৈষ্ণব ভক্তের ওপরে যে অত্যাচার করে) ব্যক্তিকে কঠোর শারীরিক শাস্তির বিধান করে গেছেন চৈতন্য। নিত্যানন্দের এক অনুগামী একবার এক কাজীকে নাকি গঙ্গাতীরে পাকড়ে ধরে বলেছিলেন ''ঝাট্ কৃষ্ণ বোল নহে ছিণ্ড এই মাথা''। মনে রাখুন বঙ্কিমের আনন্দমঠে সন্তানরা মুসলমানদের গ্রামে গিয়ে বলেছিল, ভাই

হরিনাম করবি? নিতান্তই বৈষ্ণব ঐতিহ্যবিরোধী হলে, বাস্তাবোচিত না হলে বঙ্কিম কি ওরকম লিখতেন?

প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে আজকের ইস্কন, আজকের গৌড়ীর বৈষ্ণব মঠ?

তাহলে আপনাকে প্রশ্ন করব, শাক্ত-উপাসনার কেন্দ্রস্থল দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির থেকে উদগত রামকৃষ্ণ আন্দোলনের আজকে কি দশা? তারা কি আজকের ইস্কন বা বৈষ্ণবদের তুলনায় কিছু কম ভীরু, কিছু কম এসকেপিস্ট?

৪

রাধায় সমস্যা হচ্ছে, কারণ রাধা-কৃষ্ণ অস্ত্রধারী নন। আমাদের কৃষ্ণ বংশীধারী, আর তার পাশে ইসলামিস্টদের ক্রমবর্ধমান চাপাতি (আমরা আগে জানতাম ভোজালি শব্দটা, একটু বড় আকারের প্রাণঘাতী ছোরা, অথচ তরবারির থেকে ছোট, তাকে বলা হল ভোজালি, এখন বাংলাদেশের বিশেষ রকমের বাংলা ভাষার প্রভাবে ওই ভোজালি শব্দটা প্রায় আউট হয়ে গেছে) - এ দুয়ের বিসাদৃশ্য চোখে না পড়ে যায় না। ঠিক, অস্বীকার করার জো নেই।

যুদ্ধ কিন্তু শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে হয় না। এবং কাব্য যখন রচিত হয়, তখন শুধু বীররস দিয়ে হয় না, শাস্ত্রমতে নবরসের অন্যান্য রসগুলিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বেচারা জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে গীতগোবিন্দ লিখছেন বলে আজকাল একশ্রেণীর বাঙালি হিন্দুত্ববাদীর হাতে গাল খাচ্ছেন, অথচ সেন রাজসভার সভাকবি এই জয়দেবই কিন্তু একটি বীররসের কাব্য রচনা করেছিলেন, সেটি ছিল যুদ্ধসংক্রান্ত, নীহাররঞ্জন রায়- এর স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ দিয়েছেন। দুঃখের কথা সে কাব্যটি হারিয়ে গেছে, ধ্বংস হয়েছে, আর পাওয়া যায় না। পুরো মধ্যযুগ জুড়েই তো মারাত্মক রকমের ধ্বংসলীলা চলেছে, জালিহিয়া বা ইসলামপূর্ব অতীতকে ধ্বংস করার সমস্ত রকম রাষ্ট্রীয় প্রয়াস জারি ছিল। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হল জয়দেব সম্পর্কে নেতিবাচক বা একপেশে ধারণা করার আগে কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে।

এক, রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীমূলক গাথা সেযুগের আদি বাংলা ভাষায় প্রচলিত ছিল, তাকে কৃষ্ণ ধামালী বলা হত। দোল, রাস, ঝুলন ইত্যাদি উৎসবে সেনযুগে বা পালযুগের শেষের দিকে সেই গানগুলি গাওয়া হতে থাকে, তা ছিল উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আজ যেমন আগমনী গান বা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়া দুর্গাপুজোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই উৎসবে গাওয়ার জন্য জয়দেবের গীতগোবিন্দের উৎপত্তি, অনুমান করা হয় যে সেযুগের বাংলা ভাষায় প্রচলিত কৃষ্ণধামালী থেকেই এর রূপ রস গন্ধ স্বাদ বর্ণ সমস্তকিছু আহরিত হয়েছিল, সেজন্য এত সুমধুর। এখানে গীত শব্দটি লক্ষ্য করুন-গীতগোবিন্দের গানগুলি নির্দিষ্ট তালে গাওয়া হত, আজও হয়।

এই রাধাকৃষ্ণ হলেন কালী-শিবের মতই বাংলার নিজস্ব সাংখ্য দর্শনের মূর্ত প্রতীক। বাঙালি সেই আদিকাল থেকেই প্রকৃতি-পুরুষের আরাধনা করে আসছে।

জয়দেবকে সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাদের আদিরসিক বলে উল্লেখ করেন। তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যটি সেই ভূমিকা পালন করেছিল, যা দার্শনিক-রাজনৈতিক আদর্শ বা ধর্মপ্রচারে সাহিত্য করে থাকে।

যা বলছিলাম, যুদ্ধ শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে হয় না। সে সময় পালরাজ ধর্মপাল ও দেবপাল সারা ভারত জুড়ে বাঙালির সাম্রাজ্য বিস্তার করছেন, সেসময়েই কিন্তু গড়ে উঠছে বিক্রমশীলা এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়। সেসময়েই বাঙালির মেধা ও মনন চর্চা উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছচ্ছে। একটা জাতি মানসিকভাবে দীন হয়ে যদি অনেক যুদ্ধ জিতেও নেয়, তেমন যে হয়না তা বলছি না, চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে রোমান সাম্রাজ্যে বর্বর জার্মান উপজাতিদের আক্রমণ সেরকম একটা উদাহরণ, আমাদের বাংলায় বখতিয়ার খিলজির আক্রমণ আরেকটা উদাহরণ, তো এরকম হতেই পারে যে একটা জাতি অত্যন্ত বর্বর হয়েও প্রচুর যুদ্ধ জিতে গেল, কিন্তু সেটা আদর্শ পরিস্থিতি নয়। ইসলাম যে আজও বাংলা দখল করতে পারেনি আটশো বছর ধরে প্রচুর মারমার কাটকাট করেও, তার প্রধান কারণ ওই মানসিক দীনতা। বাঙালিকে ইসলামের হাত থেকে শুধু প্রতাপাদিত্য বা সীতারামের তরবারি নয়, মূলত বাঁচিয়েছে তার দর্শন, তার মনন, তার প্রজ্ঞা, তার সাহিত্য।

যুদ্ধ শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে হয় না। যুদ্ধ হয় সেনাপতির মাথার মধ্যে, তার পরিকল্পনায়। যুদ্ধ হয় যখন সৈন্য সুষম পুষ্টিকর খাদ্য পায়। যুদ্ধ হয় যখন সৈন্যরা বিশ্রাম পায়। প্রজারা গীতগোবিন্দের অভিনয় দেখে যখন, তখন তারা যে আনন্দ পায়, সেটাও যুদ্ধের রসদ, কারণ যে রাজ্যে প্রজা আনন্দিত নয়, সে রাজ্য দীর্ঘমেয়াদীভাবে সুস্থির হতে পারে না। যুদ্ধের সময় যে বাজনা বাজানো হয়, যে শাঁখ বাজে, সেটাও যুদ্ধ। এবং সর্বোপরি, সর্বোপরি বলছি কারণ এটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, যুদ্ধজয়ের শেষে যে নতুন করে সবকিছু গড়তে হয়, সমাজ, স্বদেশ, নতুন মানুষ, নতুন ভবিষ্যৎ, তার রূপরেখা আসে সাহিত্যে, প্রেমে, দর্শনে, চিন্তায়।

যুদ্ধ শুধু বন্দুক দিয়ে হয় না। বাঙালিকে বাঁচানোর যে যুদ্ধ, সেটা শুধু তরবারি দিয়ে হবে না, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশিও চাই। বাঙালির সহজিয়া চেতনা এক বিরাট সম্পদ, বাঙালিকেসমস্ত বিদেশী কমিউনিজমের অভিঘাত থেকে এই সহজিয়াই তো রক্ষা করে, কারণ সাম্যের দর্শন তো বাংলার সহজিয়াদের নিজস্ব। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম এই সহজিয়া বা সহজযানী সাধনা থেকেই এসেছে। সহজযানে প্রকৃতি ও পুরুষের যে মিলন কল্পনা করা হয়েছে, পশ্চিমের সমস্ত দর্শন অধ্যায়ন করে আমার উপলব্ধি হয়েছে, সেরকম উচ্চস্তরের দর্শন পৃথিবীতে আর কোথাও রচিত হয়নি। একে নিয়ে গর্ব করব না? যুদ্ধ কি শুধু তীরধনুকে হয়? আমি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াই, বাঙালি হিসেবে আমার গর্বে বুক ফুলে ওঠে, সে গর্ব ছাড়া কি যুদ্ধ করা যায়? এই গর্ব, এই অহঙ্কার তো যোদ্ধার মনে থাকতেই হবে, যে তার আত্মপরিচয়, তার স্বদেশ, তার সমাজ অত্যুচ্চ, সুমহান, সুগভীর, তাই তাকে চোখের মণির মত রক্ষা করতে হবে।

৫

মধ্যযুগে মহারাষ্ট্রে শিবাজি এসেছিলেন, কিন্তু বাংলায় চৈতন্য এলেন। এর থেকে কি প্রমাণ হয় যে বাঙালি ভীরু? প্রশ্নটা যথেষ্ট প্রোভোকেটিভ এবং বেশিরভাগ বাঙালি এর আবেগমথিত উত্তর দেবেন আমরা জানি। প্রথমে যেটা বলে নেওয়া দরকার, বাংলায় শিবাজির মত গেরিলা যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না, এ ভূমি তার উপযুক্ত নয়। পূর্ববঙ্গে নদীনালা থাকার ফলে জলযুদ্ধ হতে পারত হয়ত, কিন্তু পূর্ব নয়, চৈতন্য আন্দোলন সক্রিয় ছিল মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গে। এবং পূর্ববঙ্গে বারোভুঁইয়া জলযুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছেন, নেননি তা নয়। তবে এই যুদ্ধ সফল হতে গেলে কোনও একটা কাস্টের পূর্ণ যোগদান দরকার হত। আমার মতে, শিবাজির ক্ষেত্রে যেমন মারাঠা কাস্টটি সম্পূর্ণভাবে তাঁর যুদ্ধে যোগদান করে তাঁর আর্মির পুরো মেরুদন্ড গঠন করে দিয়েছিল।

আমাদের মধ্যে কৈবর্ত, পৌণ্ড্র বা নমশূদ্রের মধ্যে থেকে মধ্যযুগে সেরকম নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারেনি, কারণটা সেন আমলের একটা বিপর্যয়। একটা কাস্ট এক্সপেরিমেন্ট হয়েছিল, সেটার ভয়াবহ পরিণাম হয়। যাই হোক, সব দোষ সেন আমলের আমি আগে মনে করলেও এখন আর সেরকম মনে করি না, কারণ পাল আমলের শেষদিকে কৈবর্তদের বিদ্রোহ হয়, ফলে তাদের ওপরে প্রচুর অত্যাচার করে তাদের সমাজে অবনমন ঘটানো হয়েছিল। সেনেরা এই কৈবর্তদের সমাজে উন্নীত করে, কিন্তু সেই পুরোনো শক্তি আর কৈবর্তরা ফিরে পায়নি। বাংলা নদীমাতৃক দেশ। কৈবর্তরা এই দেশের নৌশক্তির দ্যোতক সেই প্রাচীনকাল থেকে।

বাংলায় একজন শিবাজি কেন এলেন না, তার কারণ হিসেবে আমাদের বিদ্রোহী বারোভুঁইয়াদের কাস্ট দেখুন। প্রায় সব ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ, দুয়েকজন মুসলমান। আমাদের অন্যান্য কাস্টগুলোর শক্তি নষ্ট করে দিয়েছিলেন সেনেরা তাদের ওই উদ্ভট কাস্ট স্ট্রাকচার তৈরি করে। উদ্ভট বলছি কারণ পৌণ্ড্ররা ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁদের শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল পূর্বভারতে মহাভারতের সময় থেকে, নমশূদ্ররা ছিলেন বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ, এবং এরা উভয়েই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। এদেরকে সমাজের একদম নিম্নস্তরে ঠেলে দেওয়ার বিষময় ফল হয়েছিল। আমি উত্তরভারতে এসে দেখছি, শেডিউলড কাস্ট কারা? না চর্মকার এবং মেথররা। সেটা বোঝা যায়। কিন্তু বাংলায় শেডিউলড কাস্টের সংখ্যা অত্যাধিক বেশি, এবং কারা শেডিউলড কাস্ট? নমশূদ্ররা, যাদের সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙালির ইতিহাসে মন্তব্য করছেন যে নৃতত্ত্বগত বিচারে কখনও কখনও এই নমশূদ্ররা বাংলার ব্রাহ্মণ কায়স্থের তুলনাতেও উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণদের বেশি কাছাকাছি। যতগুলো কাস্টের সামাজিক অবনমন ঘটানো হয়, যেমন সোনার বেনে, নমশূদ্র (চন্ডাল নাম দেওয়া হয়েছিল এদের), পৌণ্ড্র, এরা সবাই বৌদ্ধধর্মের কাছাকাছি বা পালদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে বিবেচিত হয়েছিলেন সেনারাজাদের কাছে।

বাঙালির একটা ইন্ডিজেনাস এলিট বা দেশজ অভিজাতশ্রেণী ছিল, সেনেরা তাদেরকে ক্ষমতাহীন করে একদল কনৌজ-আগত ব্রাহ্মণ কায়স্থকে ক্ষমতায় বসালেন, যারা ক্ষমতায় আসীন হলেন ওপর থেকে ক্ষমতা পেয়ে। ফলে মধ্যযুগে যখন মুসলমান আগ্রাসন ঘটল, এই অংশটা অতিদ্রুত আনুগত্য পালটে নিয়ে নতুন ওপরতলার দাসত্ব শুরু করে দিল, আমাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থরা সেই যে বিদেশী শাসকদের আনুগত্য শুরু করে দিলেন, সে ট্রাডিশন আজও চলছে। মধ্যযুগে পিরালী বামুন আধুনিকযুগে ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করে সেই আনুগত্যের নাম দিল বিশ্বমানবতা, এরও পরে একদল বিশ্ববিপ্লবী হলেন এবং রাশিয়ার স্তালিন আর চীনের মাও সে তুং-এর নামে স্লোগান দিলেন, দালালির ট্রাডিশন অব্যাহত থাকল।

৬

আমি বলছি, একটা ভূমিজ নেতৃত্ব, দেশজ এলিট থাকলে এরকম হতে পারত না। উত্তর ভারতের পাঞ্জাব (এখানে

জাটেরা ছিল প্রতিরোধের নেতৃত্বে), মহারাষ্ট্র (মারাঠারা প্রতিরোধ করেছিল) প্রভৃতি স্থানগুলোর মত বাংলাতেও অত্যন্ত সফল রেজিস্ট্যান্স আর্মি গড়ে উঠত। আমাদের দেশজ ক্ষমতাকেন্দ্রগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত করার ফলেই আমাদের হার হয়েছে।

এখানে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই।

অনেকেই বলেন যে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম থাকার ফলেই বাংলা ইসলামের হাতে পরাজিত হয়েছে। কথাটা ঠিক নয়। বাংলা (সঠিকভাবে বললে পশ্চিমবঙ্গের আড়াইটে জেলা, যা বখতিয়ার তার জীবদ্দশায় দখল করতে পেরেছিল) যখন ইসলামের হানাদারদের দখলে গেল, বৌদ্ধ পালবংশের রাজত্ব তার আগেই এখানে শেষ হয়ে গেছে, এবং সনাতনী সেনদের শাসন চলছিল। বৌদ্ধ পালদের অসামান্য সামরিক শক্তি ছিল, তার বহু উদাহরণ আছে। বৌদ্ধধর্ম মোটেই অহিংসাকে কোনও ফেটিশ বানায়নি, অহিংসাকে দেবজ্ঞানে পুজো করেনি। বস্তুত বুদ্ধদেব মঝঝিম পন্থার কথা বলে গেছিলেন। আমিষাহারে বৌদ্ধদের আপত্তি ছিল না, বুদ্ধদেব স্বয়ং আমিষ খেতেন। তবে ভিক্ষুদের শুধু এমন মাছ মাংসই খেতে হত যা শুধুমাত্র তাদের ভোজনের উদ্দেশ্যেই হনন করা হয়নি (মানে আমি ভিক্ষুকে কচি পাঁঠার ঝোল খাওয়াতেই পারি, পাঁঠাটা শুধু ওর জন্য কাটলে চলবে না, অন্যদের খাওয়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে কাটতে হবে, ওই ভাবের ঘরে কিঞ্চিত চুরি আর কি)।

বৌদ্ধ রাজাদের বীরত্বের কথা দেশে ও বিদেশে বারাবার শোনা গেছে। চীনে ইসলামের আগ্রাসন যারা রুখেছেন, শ্রীলঙ্কায় যারা বহিরাগত আগ্রাসন রুখেছেন, সবাই বৌদ্ধই ছিলেন।

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম থাকার কারণে ইসলাম জেতেনি। বৌদ্ধধর্মকে হটিয়ে একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে বাংলাকে ডোবানো হয়েছিল। সেনদের নতুন সমাজসৌধের ভিতটা তখনও কাঁচা ছিল, এমন সময়ে হুড়মুড় করে এসে পড়ল ইসলাম। নতুন ক্ষমতাশালী শ্রেণী তখন অতিসহজে জোর যার মুলুক তার আপ্তবাক্য অবলম্বন করে বখতিয়ারের জোব্বার খুঁটে ঝুলে পড়লেন। সেনদের রাজসভা অন্তর্ঘাতে ভরে গিয়েছিল (একাধিক ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান। বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসেও দেখিয়েছেন। নীহাররঞ্জন বাঙালির ইতিহাসে লিখেছেন), একদল গণৎকার ব্রাহ্মণ লক্ষণ সেনকে বুঝিয়েছিলেন যে শাস্ত্রেই বর্ণনা দেওয়া আছে যে বখতিয়ার আগামী দিনে বাংলার অধিপতি হবে, কাজেই তাকে বাধা দিয়ে লাভ নেই। এরপরে তো সেনরাজার আরেক সভাকবি উমাপতিধর বৃদ্ধবয়েসে বখতিয়ারের প্রশংসা করে একটা আস্ত সংস্কৃত শ্লোকই লিখে ফেললেন।

ভালো কথা, লক্ষণ সেন যে পালিয়ে গেছিলেন বলা হয়, সেটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। উনি ফিরে এসে যুদ্ধ করেছিলেন (নীহাররঞ্জন দ্রষ্টব্য) এবং বখতিয়ারের হানাদার বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা সাময়িক রিলিফ ছাড়া আর কিছু দিতে পারেনি। আরব থেকে শুরু করে বিহার অবধি তখন একটা টানা স্ট্রেচ ইসলামের দখলে। বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিলেই বিহারে বিশ্রাম নিয়ে নতুন করে দলবল জুটিয়ে আবার এসে হানাদারি লুটপাট নারীধর্ষণ ইত্যাদি করত। ইসলামের আগ্রাসন বাংলায় সফল হয়েছিল হানাদারি আর ডাকাতির মাধ্যমে। এটাকে আটকাতে গেলে আফগানিস্তান পর্যন্ত হিন্দুসাম্রাজ্য বিস্তার করতে হত। সে সাধ্য সেনদের কেন, ভারতে কোনও হিন্দুরাজার আর ছিল না। যারা ওই সময়টা সম্পর্কে আরও জানতে চান, আমার লেখা একটা ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়ে দেখতে পারেন, নাম, ছায়া দীর্ঘ হয়। সপ্তডিঙা পুজোসংখ্যায় ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

৭

যা বলছিলাম। বাংলায় শিবাজি আসার সম্ভবনা ছিল না, একাধিক কারণে। শিবাজিকে মুসলমানরা গালাগাল দিত পাহাড়ি ইঁদুর বলে। বাংলায় পাহাড় কই যে বাংলায় একজন ওইমাপের পাহাড়ি ইঁদুর আসবেন! এদিকে ভৌগলিক কারণে বাংলা অত্যন্ত ভালনারেবল, প্রাচীনকাল থেকে দ্বারবঙ্গ যার দখলে যায়, বঙ্গও সে শক্তির দখলে যায় অবিলম্বে। এদিকে উড়িষ্যায় যেতে গেলে বাংলার রাস্তায় যেতে হয়। এই কারণে উড়িষ্যা দীর্ঘদিন ধরে ইসলামের আগ্রাসনের হাত থেকে বেঁচে গেছিল। আজও দিল্লি থেকে উড়িষ্যায় যেতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে যেতে হয়। সরাসরি কোনও রাস্তা নেই, মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দুর্লঙ্ঘ্য ছোটনাগপুর ও দণ্ডকারণ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। অন্যদিকে বিহার একবার দখল করে নিতে পারলে বাংলা দখল শুধু সময়ের অপেক্ষা এবং ভাইস ভার্সা। বাংলায় যে সাম্রাজ্যের উত্থান হয়, প্রাচীনকাল থেকেই সেটা মগধের অধিকার নিজের দখলে রেখেছে। গঙ্গারিডি যেমন। ওদিকে নন্দবংশ ও গুপ্তবংশ, দুটিরই প্রতিষ্ঠাতা বাঙালি ছিলেন, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় (অন্যদেশ পত্রিকায় আমার লেখা ধারাবাহিক বাঙালির ইতিহাস পড়ুন)। শশাঙ্ক থেকে পালসাম্রাজ্য থেকে সেনসাম্রাজ্য, সবাই ওদিকে মগধ এদিকে উড়িষ্যা জুড়ে রাজত্ব করেছেন।

বাংলা সম্পূর্ণরূপে দখলে আসার পরেই মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে উড়িষ্যার হানাদারি শুরু করেন, তার আগে পারেনি।

দ্বিতীয়ত, বাংলায় একটা ডিমিলিটারাইজেশন ঘটেছিল। চৈতন্যের জন্মের সময় মুসলমান সুলতানের প্রচন্ড অত্যাচার চলছে পশ্চিমবাংলা জুড়ে। কারণ একটা ভবিষ্যৎবাণী-নবদ্বীপে ধনুর্ধর প্রজা দেখা দেবে এবং নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হবে। এই ভবিষ্যৎবাণী কে ছড়িয়েছিল কে জানে, কিন্তু মুসলমান শাসক এটাকে খুব সিরিয়াসলি নিয়ে (বিদ্রোহের আশঙ্কা তো সবসময় ছিলই। যবন হরিদাসের ওপরে যেরকম অত্যাচার করা হয়েছিল, তা থেকে বোঝা যায় হিন্দুধর্মের প্রতি কি মারাত্মক বিদ্বেষ ছিল এই হুসেন শাহের, ফলে পালটা প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাও থাকত) নবদ্বীপে অত্যাচার শুরু করেছিল। ধনুর্বাণ কারও বাড়িতে পাওয়া গেলে প্রায় স্বদেশী আমলে বাড়িতে পিস্তল বা বোমা মেলার মত অবস্থা। কয়েকজন তো মরবেই। এমন অবস্থায় এই জাতি সশস্ত্র প্রতিরোধ করবে কি করে! বাঙালির হাতে যেন অস্ত্র না থাকে, তারজন্য বিদেশী শাসকেরা (হুসেন ছিলেন আরবের সৈয়দ) তো চেষ্টার কোনও কসুর করেন নি।

চৈতন্যরা এইসময়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে নবজাত বৈষ্ণব আন্দোলনটিকে মুসলমান শাসক আঁতুড়ঘরেই হত্যা করতেন, সেই মিসঅ্যাডভেঞ্চার না ঘটিয়ে ধৈর্য্য ধরে গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথটিই ওদের কাছে সঠিক মনে হয়েছিল। খুব একটা ভুল করেননি। আরএসএস দেখুন, ইংরেজের সঙ্গে লড়তে যায়নি, দিব্যি ফুলেফেঁপে উঠেছে আজ। বাঙালি বিপ্লবীদের দেখুন, ইংরেজের সঙ্গে রক্তারক্তি মারামারি করতে গেছিল, ইংরেজ আমাদের জাতটাকে পুরো ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। যে জাতি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সবথেকে বেশি রক্ত দিল, আজ স্বাধীন ভারতে সেই জাতিই সবথেকে বেশি কোনঠাসা। আমাদের মধ্যে বিশ্বমানব আর বিশ্ববিপ্লবীদের রাজত্ব শুরু করে দিয়ে বাঙালি জাতিটাকে ভেতর থেকে পয়জন করে গেছে সাহেবরা। হাতে অস্ত্র নেওয়ার হ্যাপা তো কম নয়!

বঙ্কিম বলছেন, হায় লাঠি, তোমার দিন গিয়াছে। বঙ্কিম যেটা খেয়াল করেন নি, সেটা হল বাঙালি বাধ্য হয়ে এই লাঠির মার্শাল আর্টকে তার সবেধন নীলমনি একমাত্র প্রতিরক্ষার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলেছিল মধ্যযুগে। কারণ প্রতাপকে হারিয়ে, বারোভুঁইয়ার বিদ্রোহ নষ্ট করে দেওয়ার পর থেকেই বাঙালির হাতে হাতে আর বন্দুক কামান প্রভৃতি অস্ত্র আর না থাকে, সেটা নিশ্চিত করেছিল মোগল প্রশাসন, সে অবশ্য চৈতন্য আন্দোলনেরও বেশ পরে। যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের অনেকগুলো দুর্গ ছিল। গঙ্গার ধারে শ্যামনগরে প্রতাপের দুর্গ ছিল, সেজন্য নাম ছিল ''সামনে গড়'' (সেখান থেকে পরে শ্যামনগর হয়েছে, যখন পুরোনো দিনের কেল্লার স্মৃতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল)। বাগবাজারেও গঙ্গার ধারে ছিল প্রতাপের দুর্গ, ইংরেজ আমল পর্যন্ত টিকে ছিল সেটি। এবার এই প্রতাপকে হটিয়ে যে ''তিন মজুমদারে বাংলা ভাগ''-এর কথা আমরা শুনি (কৃষ্ণনগরের রাজবংশ, সাবর্ণ রায়চৌধুরী এবং সপ্তগ্রামের রাজবংশ- এই তিনজনের মধ্যে যশোরের রাজত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। কলকাতা সহ সম্পূর্ণ চব্বিশ পরগণা বলা বাহুল্য যশোরের অংশ ছিল। প্রতাপের সেনাপতি শঙ্কর চক্রবর্তী ছিলেন বারাসাতের ছেলে), এদের মধ্যে একজনেরও আর কোনও দুর্গের কথা শুনবেন না। কোথাও শুনবেন না, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি। দুর্গের পাটই বরাবরের মত চুকে গেল। একদল ঠুঁটো জগন্নাথকে ক্ষমতায় বসানো হল, যাতে মোগল সাম্রাজ্য নিরাপদ থাকে। এমতাবস্থায় বাঙালি আর করে কি, লাঠিকেই আঁকড়ে ধরল। বলা হত সেরকম দক্ষ লাঠিয়াল একাই পঞ্চাশজনের মহড়া নিতে পারতেন। সে কথা যাক।

কথা হল, বাংলার বুকে একটার পর একটা ওয়েভ অভ ডিমিলিটারাইজেশন ঘটেছে। মধ্যযুগ থেকেই। আতঙ্কিত বিদেশী শাসক বাঙালির হাতে অস্ত্র দেখতে চায়নি। ফার্সী ভাষায় একটা প্রবাদই তৈরি হয়েছিল, হুনর-এ-চীন, হুজ্জত-এ-বঙ্গাল। চীনেদের স্কিল, আর বাঙালির হুজ্জোত। বাঙালি যে কি বিষম বেগ দিয়েছে মধ্যযুগে ইসলামিক শাসকদের, তার পূর্ণ ইতিহাস আজও রচনা করা হয়নি। কিন্তু সঙ্ঘশক্তি না থাকার ফলে, সেন আমলের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এক্সপেরিমেন্টের ফলে বাঙালির দেশজ পাওয়ার ব্লকগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেই প্রতিরোধ কখনও পূর্ণ সাফল্য পায়নি।

৮

এবার এই প্রেক্ষিতে চৈতন্য আন্দোলনকে বিচার করে দেখি।

এক, সেন আমলের এক্সপেরিমেন্টের বিষময় এন্ডরেজাল্টের অপনোদন করছে চৈতন্য আন্দোলন। বলছে, চন্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যদি হরিনাম করে, যদি হরিভক্তি থাকে। এক মাস্টারস্ট্রোকে বাংলার ও বাঙালির প্রধান সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত করলেন চৈতন্য। এ সমস্যার সমাধান শাক্তদের

কাছে ছিল না। তাদের তো সে যুগে ছিল সব ব্যক্তিগত সাধনা, ব্যক্তিগত মোক্ষ। অনেক পরে শাক্তরাও ভক্তি আন্দোলন করলেন, রামপ্রসাদের গানগুলো তার সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু সেটা ব্যাপ্তিতে বৈষ্ণব আন্দোলনের ধারেকাছে যেতে পারেনি। বাঙালির হাজার একটা দুর্গাপুজো আর কালীপুজো হয় আজ, কিন্তু বাঙালি ঐক্যের পেছনে তাদের ভূমিকা কি? দুর্গাপুজোর খাওয়া দাওয়া আর নতুন কাপড় আর নতুন জুতো, ব্যাস। শোচনীয় অবস্থা। কারণ কোনও সেন্ট্রালি অর্গানাইজড স্ট্রাকচার নেই, সব খন্ড খন্ড হয়ে আছে, এক পাড়ায় বারো রাজপুত্রের তেরো হাঁড়ির মত একগাদা বারোয়ারি পুজো হয়। সে তুলনায় চৈতন্যের পাঁচশো বছর পরেও আজ বৈষ্ণবদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন দেখে চমকে উঠতে হয়ে। নিত্যানন্দ যে দ্বাদশ গোপালকে নির্বাচিত করে গেছিলেন, তাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের এই ঐক্য পরম্পরাগতভাবে ধরে রেখেছেন। এ লেখা যখন লিখছি, আজই ইস্কন মন্দির আক্রান্ত হয়েছে সিলেটে, কিন্তু তার এমনই আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে যে কলকাতার প্রো-বাংলাদেশ সেক্যুলার বামাতি বুদ্ধিজীবীকেও দেখছি যে তার নিন্দা করে ফেসবুকে পোস্ট দিতে। ইস্কনের হাজার একটা দোষ, কিন্তু লবিটি চমৎকার এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিস্তৃত, অস্বীকার করি কি করে!

দুই, বাঙালিকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে শেখাচ্ছে চৈতন্য আন্দোলন। এই সঙ্ঘবদ্ধতা যদি সামরিক প্রতিরোধের দিকে যেত, তাহলে কি হতে পারত, সে আলোচনায় যাওয়ার মানে হয় না। কিন্তু বাস্তবটা দেখতে হবে। পশ্চিমবাংলার সমতল ভূমিতে, যেখানে কুচবিহার থেকে গঙ্গাসাগর অবধি গেরিলা যুদ্ধ চালানোর কোনও ভৌগলিক সুবিধেই নেই, সেখানে চৈতন্য নিত্যানন্দরা ওই সামরিক আন্দোলন করতেন কিভাবে? অত্যাধিক ডিমিলিটারাইজেশনের ফলে অস্ত্রও তো নেই, অস্ত্রশিক্ষাই বা দেবে কে?

তিন, বৈষ্ণব আন্দোলনের একটা সাত্ত্বিক অভিমুখ ছিল। এখন আমরা বলতেই পারি যে রাজসিক গুণাবলী চাই, ইসলামের আগ্রাসনের সামনে সাত্ত্বিক সাধনা যথেষ্ট নয়। মনে রাখতে হবে জীবহিংসার বিরুদ্ধে বাংলায় শুধু নয়, ভারতে অন্তত আড়াই হাজার বছর ধরে একটা সেন্টিমেন্ট কাজ করেছে। বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি ধর্মগুলি যে বারবার বৈদিক যজ্ঞে পশুবলির নিন্দা করেছে শুধু তাই নয়, ঋণ করে ঘি খাওয়ায় বিশ্বাসী লোকায়ত চার্বাক দর্শনও কিন্তু পশুবলির নিন্দা করেছে (যদি পশুবলি দিলে পশুটি স্বর্গে যায় তাহলে পিতামাতাকেও সে পথে স্বর্গে কেন পাঠাচ্ছ না, একটি চার্বাক শ্লোক বলছে)।

ভারতের এই দীর্ঘ ইতিহাসটা স্মরণে রাখলে, গান্ধীর মত একজন যাকে মোটামুটি ইংরেজ শাসকের এজেন্ট বললে খুব ভুল হয় না, স্বাধীনতা আন্দোলনে তার অহিংস আন্দোলনের এমন অবিশ্বাস্য সাফল্যের ইতিহাস স্মরণে রাখলে, চৈতন্য ও বৈষ্ণব আন্দোলনে রক্তপাত ও জীবহিংসা সম্পর্কে সাধারণ অনীহাকে খুব একটা সৃষ্টিছাড়া একদমই বলা যায় না। আর ভালো কথা, পাঁঠার বদলে চালকুমড়ো বলি দেওয়াটা কিন্তু অস্ত্র থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া নয়। আপনারা পুজোর সময় খাঁড়া ব্যবহার করে এক কোপে চালকুমড়ো বা আখ বলি দিলে দেখবেন, ওতে অস্ত্রের প্রয়োগ শেখা যায় কিন্তু অনর্থক জীবহিংসার দরকার হয় না। বাংলার বিখ্যাততম বৈষ্ণব রাজবংশ বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মল্লবংশ, তাদের বীরত্বের কথা তো আমরা সবাই জানি।

চার, বঙ্কিমের সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করুন। বাঙালির বাহুবল নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, বাহুবল কিন্তু ঠিক শারীরিক বল নয়। কাবুলিওয়ালার গায়ে এমন জোর যে তার এক ঘুঁষিতে অনেক ব্রিটিশপুঙ্গব শয্যা নিয়েছে। অথচ কাবুলির সঙ্গে বাঙালির স্রেফ পেস্তা আর মেওয়ার সম্পর্ক রইল, কিন্তু ব্রিটিশরা হল আমাদের শাসক, বঙ্কিম এর কারণ খুঁজতে আহ্বান জানাচ্ছেন।

সেরকমভাবেই, বাহুবল মানে শুধু সামরিক বল নয়। সঙ্ঘশক্তির থেকে বড় বাহুবল আর কি কিছু আছে? চৈতন্য আন্দোলন বাঙালিকে মধ্যযুগে প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ করেছিল, অর্থাৎ বাঙালির বাহুবলের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। ওরা সামরিক প্রতিরোধের কথা কেন ভাবেন নি, তার একাধিক কারণ আছে, সে তো বারবার বলছি।

বিখ্যাত পশ্চিমী তাত্ত্বিক টেরি ইগলটন যীশু সম্পর্কে বলেছিলেন, হি ওয়াজ বোথ মোর অ্যান্ড লেস দ্যান আ রেভলিউশনারি। ওই কথা চৈতন্যের ক্ষেত্রেও খাটে। চৈতন্য একজন বিপ্লবীর থেকে বেশি ছিলেন, তিনি বাংলায় যে আমূল সামাজিক বিপ্লব ঘটালেন, তার সুফল বহু শতাব্দী ধরে বাঙালি ভোগ করবে। কিন্তু চৈতন্য বিশ্বাস করতেন হরিভক্তিই ত্রাণ, তিনি মুসলমান শাসককে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখানোয় বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি ঐহিক ছিলেন না। অস্ত্র, সমর এগুলো আমাদের মত ঐহিকদের কনসার্ন। চৈতন্য এগুলোর উর্ধ্বে একটা অমৃতলোকের সন্ধানী ছিলেন, তাই তিনি বিপ্লবের থেকে কিছুটা বেশি এবং কিছুটা কম ছিলেন।

পাঁচ, রাধা-কৃষ্ণের যুগল-উপাসনা বাঙালির নিজস্ব ধর্ম, সাংখ্য দর্শন, যেখানে বাঙালির শেকড় বলে আমি মনে করি।

ইতিহাসবিদ অতুল সুর বলছেন যে বাঙালি ভারতে ও বহির্ভারতে যেখানেই গেছে সেখানেই এই প্রকৃতি-পুরুষের উপাসনা বহন করে নিয়ে গেছে। এই শেকড়ে বাঙালিকে পুনর্বার ফিরিয়েছেন চৈতন্য।

যে গাছের শেকড় শক্তপোক্ত ও গভীর, তাকে সহজে উচ্ছেদ করা যায় না। কান্ড কেটে ফেলে উপড়ে নিলেও সেই শেকড় থেকে আবার নতুন গাছ জন্মায়। বাঙালি বারবার এভাবে জন্মেছে সেই মধ্যযুগ থেকে আধুনিককালে, এবং এর কিছুটা কৃতিত্ব চৈতন্যকে দিতেই হয়।

৯

আর বেশ কিছু গবেষকের মত আমিও মনে করি যে চৈতন্যকে পুরীতে হত্যা করা হয়েছিল, এ নিয়ে আমার একাধিক প্রবন্ধ আছে, এই অপবাদে যে তিনি গৌড়ের মুসলমান শাসকের স্পাই। এখন শত্রু আক্রমণের সময় এই ধরণের চক্রান্ত ও আত্মবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হওয়া আশ্চর্য কিছু না, পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে হয়েছে দেখা যায়। কিন্তু এই যে একটা গুজব ছড়ানো হয় (মূলত পান্ডাদের একাংশের তরফ থেকে) যে চৈতন্য আন্দোলন উড়িষ্যার বাহুবল নষ্ট করে দিয়েছিল এবং চৈতন্য ছিলেন বাংলার মুসলমান সুলতানের স্পাই, এটা ডাহা মিথ্যে।

উড়িষ্যার সামরিক শক্তির হ্রাস হওয়ার পেছনে একাধিক কারণ ছিল। সবাই সমবেত সংকীর্তন করলে শক্তিহ্রাস হয়, না শক্তিবৃদ্ধি হয়, সেটা পৃথিবীতে আধুনিক যুগে মিছিলের ইতিহাস বলে দেয়। সমবেত হরিধ্বনি দিয়ে হিন্দুদের সেই মিছিল, সেই নবলব্ধ সঙ্ঘশক্তি বরং হিন্দুসমাজের দাপুটে পুনর্জাগরণ ছিল। প্রভাত মুখার্জি মেডায়েভাল বৈষ্ণবিজম ইন ওড়িশা বইতে ''চৈতন্য আন্দোলনের ফলে মুসলমান আগ্রাসনের সামনে উড়িষ্যার পরাজয়'' তত্ত্বটিকে তথ্য ও যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন, আগ্রহীরা বইটা পড়ে দেখতে পারেন।

চৈতন্য স্পাই ছিলেন, এ বক্তব্যের উত্তর করতেও ঘৃণাবোধ হয়। আমি একদল বামপন্থীকে বলতে শুনেছি যে বঙ্কিম ইংরেজের স্পাই ছিলেন। এটাও ওইরকম কথা আর কি। যার লেখা থেকে ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবের জন্ম হল, তিনিই ইংরেজের দালাল, এরকম বক্তব্য সমালোচনার যোগ্য নয়। বঙ্কিমকে একবার রামকৃষ্ণ জিগ্যেস করেছিলেন, তুমি কিসে বঙ্কিম (বাঁকা) হলে গো? বঙ্কিম বলেছিলেন, ইংরেজের জুতোর চোটে। অজস্র হেনস্থা ভোগ করেছেন চাকুরিজীবনে, তবু বঙ্কিম ইংরেজদের কাছে কোনওদিন আত্মসমর্পণ করেননি। 'আনন্দমঠ' লেখার জন্য চাকুরিজীবন সঙ্কটে পড়েছিল, বঙ্কিমের ডিমোশন হয়েছিল, শেষবয়েসে ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নেন বঙ্কিম। বঙ্কিমের জীবনের ইতিহাস আমরা যারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি, আমরা জানি ওই ''বঙ্কিম ইংরেজের দালাল'' তত্ত্বটি কত অসার। চৈতন্যের জীবনী পড়লে দেখি, মুসলমান শাসক চৈতন্যকে হত্যা করতে পারে এই আশঙ্কায় বাংলায় বৈষ্ণবরা তাঁকে উড়িষ্যায় পাঠিয়ে দেন। সেই চৈতন্যই মুসলমানের স্পাই ছিলেন, সেটা পান্ডাদের একাংশের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত গুজব ছাড়া আর কিছু নয়।

এই পান্ডারাই পরে কালাপাহাড়ের জন্ম দেয়। কালাচাঁদ রায় বাধ্য হয়ে মুসলমান সুলতানের মেয়েকে বিয়ে করার পরে পুরীর মন্দিরে সাতদিন হত্যে দিয়ে পড়ে ছিলেন, নির্জলা উপবাসী। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুসমাজে ফিরতে চাইছিলেন। পান্ডারা সপ্তম দিনে তাকে মারতে মারতে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। কালাচাঁদ ফিরে এসেছিলেন কালাপাহাড় হয়ে, বুকে প্রতিশোধের আগুন। ভালোবেসে, কমপ্যাশন ও সহানুভূতির সঙ্গে যে সমস্যার সমধান হতে পারত, অতিরিক্ত কঠোরতা দেখাতে গিয়ে ওরা সেটার বারোটা বাজালেন। আমি বারবার বলছি, আজকে উড়িষ্যার কম মুসলমান, বাংলায় অনেক বেশি, এই তুলনায় যাবেন না। উড়িষ্যা স্রেফ ভৌগলিক কারণে সুবিধে পেয়েছে, যেটা দক্ষিণ ভারতও খানিকটা পেয়েছিল (বিন্ধ্যের আড়াল)। এতদ্বারা বাঙালির কাপুরুষতা এবং উড়িয়াদের বীরত্ব কোনওমতেই প্রমাণ হয় না। থাকত বাংলার পশ্চিমজোড়া ওরকম পার্বত্য আরণ্যক আড়াল, আমি চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলছি, সেনসাম্রাজ্যে দাঁত ফোটাতে আরও তিনশো বছর লেগে যেত বখতিয়ারের ছানাপোনাদের।

যাই হোক, প্রসঙ্গ হল পান্ডাতন্ত্রের নিষ্করুণ দাওয়াই। এরসঙ্গে তুলনা করুন চৈতন্য আন্দোলনের। সুবুদ্ধি রায়কে হুসেন শাহ জোর করে মুসলমান করলেন। সুবুদ্ধি চাইলেন প্রায়শ্চিত্ত করে ফিরে আসতে হিন্দুধর্মে। বামুনেরা বিধান দিল, তুষানলে প্রবেশ করে বা ফুটন্ত ঘি খেয়ে আত্মহত্যা করো গে যাও। চৈতন্য তখন সুবুদ্ধিকে বললেন, তুমি বৃন্দাবনে যাও, সেখানে গিয়ে বৈষ্ণব আন্দোলন গড়ে তোলো।

এই হলেন নেতা, হিন্দুদের ভালোমন্দ যিনি চিন্তা করার ক্ষমতা রাখেন, যিনি যবন হরিদাস সহ আরও অনেক মুসলমানকে বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্বে তুলে এনেছিলেন পরম মমতায়। যবন হরিদাস আসলে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে যে কথাটা পরে চালু করা হয়েছে, সেটা অনৈতিহাসিক। হরিদাস জন্মসূত্রে মুসলমান ছিলেন বলেই তাঁর ওপরে এমন মারাত্মক

অত্যাচারের ব্যবস্থা হয়েছিল, নথি সেরকমই বলছে। শরীয়া অনুযায়ী কোনও মুসলমান যদি ইসলাম ত্যাগ করে, তার শাস্তি মৃত্যু। হরিদাসকে তাই বাইশটি বাজারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেত্রাঘাত করে সবাইকে দেখিয়ে একটা দৃষ্টান্তমূলকভাবে মেরে ফেলার হুকুম দেন গৌড়ের সুলতান। অনেক পরে রূপ ও সনাতন (এরা হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন এবং এরা মুসলমান হয়েছিলেন, তার বেশ কিছু প্রমাণ আছে। এরা দবীর খাস ও সাকর মল্লিক নামে পরিচিত ছিলেন হুসেন শাহের রাজসভায়, এদেরকেও চৈতন্য টেনে আনেন বৈষ্ণব আন্দোলনে এবং এর ফলে বলা হয় হুসেন শাহের প্রশাসনের মেরুদন্ড ভেঙে গিয়েছিল) যদি কখনো পুরীতে আসতেন, এরা হরিদাসের আশ্রমেই উঠতেন, সমুদ্রতীরে, পুরীর মন্দির থেকে অনেকটা দূরে। হরিদাস বা রূপ সনাতনকে পুরীর মন্দিরে কোনদিনও ঢুকতে দেয়নি পান্ডারা। আজ আমাদের ঠিক করতে হবে, ভবিষ্যতের কর্মপন্থা কাদের দেখে শিখব আমরা, এই পান্ডাতন্ত্র, না চৈতন্যতন্ত্র।

শোনা যায় কাশ্মীরে একবার মুসলমানদের হিন্দু করার কথা হয়েছিল। মধ্যযুগের কথা। মুসলমানরাও রাজি ছিল। পন্ডিত অর্থাৎ কাশ্মীরী বামুনরা বেঁকে বসে, বলে যে মুসলমানদের হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা হলে তারা জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মহত্যা করবেন। অবিশ্যি এর অনেক পরে পন্ডিতেরা কাশ্মীর থেকেই বিতাড়িত হলেন।

বাংলার হিন্দুর অবস্থা যে কাশ্মীরের পন্ডিতের মত হয়নি আজও তার পেছনে কি চৈতন্যের প্রেমান্দোলন কিছুটা ক্রেডিট নিতে পারে? বাংলার ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি কি হবে আমাদের, চৈতন্য আন্দোলন কি সেদিক পথনির্দেশ করছে? এগুলো সিরিয়াস আলোচনার বিষয়, সে আলোচনা আমাদের বারবার করতে হবে, কিন্তু যে কথা বলে শেষ করতে চাই, তা হল বৈষ্ণব আন্দোলনের পুনর্মূল্যায়নের আশু প্রয়োজন। সে পুনর্মূল্যায়ন বৈষ্ণব আন্দোলনকেও করতে হবে। রামকৃষ্ণ আন্দোলনেরও করতে হবে, সমস্ত হিন্দুধর্মভিত্তিক সংগঠনেরই সে কাজ করার সময় এসেছে। একটা আগ্রাসন চলছে, পৃথিবীজোড়া আগ্রাসন, তার সামনে প্রতিরোধের নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার না করতে পারলে আমাদের মহান পূর্বসূরীদের যোগ্য উত্তরাধিকারের দাবী আমরা রাখতে পারব না ইতিহাসের কাছে। চৈতন্য আন্দোলন আমার কাছে বাঙালির বাহুবল, বাঙালির শক্তি-উপাসনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কেন, এই প্রবন্ধে সে কথা বোঝানোর চেষ্টা করলাম এতক্ষণ। রাধা-কৃষ্ণের উপাসনা কোনমতেই বাঙালির দুর্বলতা নয়, বরং বাঙালির বিশাল সামাজিক শক্তি এবং বাঙালির শেকড় এবং বাঙালির সামাজিক ভিত্তি। যুদ্ধ তো একদিন থেমে যাবে, কিন্তু সেদিন যদি ঝুলন না থাকে, যদি আমরা রথ না টানি, যদি রাসপূর্ণিমার মেলা না বসে, যদি জন্মাষ্টমীতে বাংলার ঘরে ঘরে কীর্তন না হয়, যদি জয়দেব কেঁদুলির মেলায় না যেতে পারি, তবে জীবন তো মরুভূমি! শুধু তো প্রতিপক্ষকে ভাঙলে হয় না, নিজের ঘর গড়তেও তো হয়। চৈতন্য আন্দোলন সেই সমাজ গড়ে তোলার শিক্ষাই দিয়েছে আমাদের, কাজেই বাঙালির বাহুবলের সঙ্গে বাঙালির বৈষ্ণব আন্দোলনের কোনো বিরোধ নেই।

বাঙালির জয় হোক! জয় গৌড়, জয় বঙ্গ! জয় নিতাই, জয় গৌর!

সর্বধর্ম সমন্বয়ের অবতার প্রমাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সূক্ষ্ম শরীরে কুকুরের মধ্যে প্রবেশ করানো হল, দুর্গন্ধযুক্ত পচা গলা গোমাংস খাবার মত ঘৃণ্য কুরুচিকর কষ্টকল্পনা করা হল [সূত্রঃ রামকৃষ্ণ পুঁথি, লেখক- অক্ষয় কুমার সেন]। বিবেকানন্দের ভাষায় দাসজাতির উপযুক্ত কল্পনা বটে, অথচ ইসলামে গোরু খাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। সন্দেহজনক ব্যক্তির কাছে ইসলামে দীক্ষা নিয়ে পাঁচওক্ত না পড়ে ত্রিসন্ধ্যা নামাজ পড়ে রামকৃষ্ণের গোরু খাবার ইচ্ছা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলো। কিন্তু ইসলামে অপরিহার্য্য ছুন্নতে তাঁর কোন আগ্রহ দেখা গেল না, এ ব্যাপারে কেউ কিছু লিখে রাখেননি।—শিবপ্রসাদ রায়

এই লড়াইয়ের বীজ মন্ত্র

দেবতনু ভট্টাচার্য্য

একবার এক ভদ্রলোক সাতসকালে পুকুরের পাড়ে দাড়িয়ে দাঁতন করছিলেন। সেই সময় পুকুরের পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়ে অন্য এক ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি প্রথম ব্যক্তিকে দেখে দাঁড়ালেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা সমীরবাবুর বাড়ি যেতে কত সময় লাগবে বলতে পারেন?'

প্রথম ব্যক্তি কোন উত্তর না দিয়ে আপন মনে দাঁতন করতে লাগলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার একই প্রশ্ন করলেন কিন্তু প্রথম ব্যক্তিটি যথারীতি কোন উত্তর দিলেন না।

বিরক্ত হয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

হাঁটতে শুরু করার সাথে সাথে প্রথম ব্যক্তিটি ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, 'পাঁচ মিনিট লাগবে দাদা'।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, 'আপনি তো আজব মানুষ মশাই। যখন ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন কোন উত্তর দিলেন না। আর হাঁটা শুরু করতেই পিছন থেকে ডেকে বলছেন পাঁচ মিনিট!'

প্রথম ব্যক্তিটি তখন বললেন, 'যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, তখন আপনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই তখন উত্তর দিলে বলতে হত যে আপনি কোনদিনই পৌঁছাতে পারবেন না। কারণ স্থির বস্তুর কোথাও পৌঁছানোর কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু হাঁটতে শুরু করার পরে আপনার হাঁটার গতি দেখে হিসাব করে বলতে পারলাম পাঁচ মিনিট লাগবে।'

আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, 'দাদা, কবে হিন্দুর সমস্যার সমাধান হবে?

আমার উত্তর, 'আপনার আকুতির মাত্রা এবং সমর্পণ ভাবের উপরে সেটা নির্ভর করছে।'

প্রথমতঃ আপনার কি সেই আকুতি আছে? গ্রামে গঞ্জে হিন্দুর পায়ের তলার মাটি চলে যাচ্ছে। দেখে আপনার কি মনে হয় যে আপনার নিজের মাটি চলে গেল? সেখানে হিন্দু মা-বোনের সম্ভ্রমহানি হলে আপনার মনে কি বেদনার অনুভব হয়? হিন্দুসমাজ থেকে লাভ জেহাদের শিকার হয়ে কোনও এক বোন যখন অন্য সমাজে চলে যায়, তখন কি আপনি একজন স্বজন হারানোর ব্যথা অনুভব করেন? যখন হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা হয়, মঠ-মন্দির অপবিত্র করা হয়, আপনার মনে পবিত্র ক্রোধের আগুন কি সেইভাবে জ্বলে ওঠে? ধরে নিলাম এইসব ঘটনা আপনাকে অস্থির করে তোলে। প্রশ্ন হল, তখন আপনি কী করেন? বেশীরভাগ লোকের মত কিছুক্ষণের জন্য নিজের ব্লাড প্রেসার বাড়িয়ে, জেহাদীদের কয়েকটা খিস্তি খাস্তা করে, সরকারের মুণ্ডপাত করে, 'হিন্দুদের একতা নেই', হিন্দুর শিক্ষা হবে না', 'হিন্দু মেয়েগুলো বজ্জাত'- এই জাতীয় কয়েকটা মন্তব্য করে নিজেকে হালকা করে আবার নিজের কাজে লেগে পড়েন। না কি অ্যান্ড্রয়েড সেটটা হাতে নিয়ে ফেসবুকে কয়েক লাইন লিখে প্রেসার কুকারের সিটির মত নিজের প্রেসার রিলিজ করে শান্ত হয়ে যান।

এখন নিশ্চয় আপনি ভাবছেন-'আমি একা কী করতে পারি'? 'আমাদের পরিবার চালাতে হয়, তাই দেশ চালানোর দায়িত্ব সরকারের নিতে হবে', কিংবা হয়তো ভাবছেন, তপন ঘোষের মত যারা সংগঠন খুলে বসেছেন- এই দায়িত্ব তো তাদেরই! কি, ঠিক বলছি তো? এই সমস্যার সমাধান কল্পে কেউ এগিয়ে আসুক বা না আসুক আমি এগিয়ে যাবো। তার জন্য যে কোন মূল্য দিতে হলে আমি তা দেবো- এইভাবে ভাবার সাহস দেখাতে হবে। আজ সাহস না দেখালে কালকে মাটি ছাড়তে হবে। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' আর 'দেব দুর্বল ঘাতকঃ'-এই দুটো কথা মনে রাখতে হবে। আজকে সাহস দেখিয়ে এগিয়ে আসুন, কালকে বাকী সমাজ আপনাকে অনুসরণ করবে। যারা আপনার মত দৃঢ়সংকল্প হয়ে এগিয়ে আসবেন, তাঁদের নিয়ে হবে সংগঠন। এই সংগঠন ভেড়াদের সংগঠন হবে না, হবে সিংহের দল। চাই শক্তির সমন্বয়, সংখ্যার ভিড় নয়। দেবী দুর্গা এই সমন্বিত শক্তিরই প্রতীক। মনে রাখবেন দশপ্রহরণধারিনী মা দুর্গার আরাধনার অর্থ শক্তির সাধনায় রত হওয়া। নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে হা-হুতাশ করলে চলবে না। আসুন, হিন্দুর অস্তিত্ব ও অস্মিতা রক্ষার এই লড়াইয়ে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি। আর এই লড়াইয়ের বীজ মন্ত্র হোক সাহস, শক্তি ও সক্রিয়তা।

আদিনা মসজিদ কি সত্যিই মসজিদ ?

ইন্দ্রজিৎ

ঐ যে বলে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, আমার হয়েছে তাই। গরমের ছুটিতে সহকর্মীরা সিমলা গেলো, বন্ধুরা গেলো কালিম্পং আর জুন মাসের তীব্র দাবদাহে আমি চলে এলাম মালদহে। উদ্দেশ্য একটি বিতর্কিত স্থাপত্য পরিদর্শন। নাম- আদিনা মসজিদ।

মালদহ জেলার গাজোল থানার ৩৯ নং মৌজায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় মসজিদ আদিনা মসজিদ। বলা হয় এই মসজিদ শুধু বাংলার সর্বাধিক আয়তনের মসজিদই নয় বরং পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বিতীয় সর্বাধিক আয়তনের মসজিদ। এর স্থান দিল্লীর জামি মসজিদের পরেই। তথ্য সংগ্রহ করা, ছবি তোলা ইত্যাদির সাথে অনেকগুলি ইতিহাসের বই এবং ইন্টারনেট ঘেঁটে পড়াশুনা করলাম। দেখলাম, ইতিহাসের বই থেকে ইন্টারনেট, আদিনা সম্পর্কে বেশিরভাগ রচনায় প্রামাণ্য সূত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে খান সাহেব আহিদ আলি খান এর ''গৌড়-পাণ্ডুয়ার স্মৃতি'' নামক একটি গ্রন্থকে। আবিদ আলি খান ছিলেন বিংশ

শতাব্দীর প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে বাংলা সরকারের পূর্ত বিভাগের কর্মচারী। তিনি দীর্ঘদিন গৌড় পাণ্ডুয়ার প্রাচীন পুরাকীর্তিগুলির বিশেষ মেরামতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার সুবাদে দীর্ঘদিন মালদহে অবস্থান করে তাঁর সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর কাজে খুশি হয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাঁকে ''খান সাহেব'' উপাধিতে ভূষিত করেন।

আদিনা মসজিদ সম্পর্কে কিছু জানার আগে তার গঠন সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচিতি প্রয়োজন। আখতার হোসেন পর্যবেক্ষণ গৌড় পাণ্ডুয়া গ্রন্থে আবিদ আলিকে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করে লিখেছেন, ''আবিদ আলির মতে, ১৩৬৪ থেকে আরম্ভ করে ১৩৭৪ সালে এর কাজ শেষ করা হয়। মসজিদটি অপূর্ব কাঠামোতে তৈরি। মসজিদের দক্ষিণ পাশে জনসাধারণের নামাজ পড়ার স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এখানে ১৮টি মিম্বার রয়েছে এবং এগুলির প্রতিটির উপরের দিকে পাথরের কাজ রয়েছে। কেন্দ্রীয় হলঘরে মাটি থেকে ৮ ফুট উপরে একটি আসন রয়েছে যার নাম 'বাদশাহ কি তখৎ'। এর পাশে এবং বহির্গমনের পথ ছিল পশ্চিমদিকে। এখানকার মেহরাব অংশ চতুর্দিকে কোরানের বাণী দিয়ে ঘেরা। এখানে তিনটি মেহরাব এবং দুটি দরজা রয়েছে। সেগুলির চতুর্দিকে যে লেখা এবং ফুল আঁকা রয়েছে তা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

পশ্চিমের দরজা দিয়ে ওঠার সময় দরজার উপরে (বৌদ্ধ) মূর্তি চেঁছে তোলার চিহ্ন দেখা যায়। দরজা পেরিয়ে যে স্থানটি দেখা যায় তা সিকান্দার শাহের কবর নামে পরিচিত। এই ঘরের গম্বুজটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। স্থানটি পেরিয়ে বাদশাহ কি তখতে যাওয়া যায়। এবং প্রবেশদ্বারের চৌকাঠে বহু নৃত্যরত মূর্তি চেঁছে তোলার পরিচয় পাওয়া যায়। দরজার চৌকাঠগুলি বিভিন্ন নকশায় সজ্জিত, যা সেই যুগের হিন্দু ভাস্কর্যের পরিচয়। এর মিম্বারটি মধ্যে অবস্থিত না হয়ে একটু দক্ষিণে অবস্থিত এবং এটি দ্বিতল। যাতে উভয় তলের মানুষ তাকে দেখতে এবং খুতবা শুনতে পান। এই মঞ্চটির নিচের তলের ছাদের ভিতরদিকে অসংখ্য নকশি এবং পদ্মফুলের ছড়াছড়ি দেখা যায়। এর উপরের তলের ছাদটি ভেঙ্গে গেছে।

এই মিম্বারের সংলগ্ন রয়েছে এই কেন্দ্রীয় মেহরাবটি। এটি আকারে বিরাট। এর সর্ব উপরে রয়েছে জানালা। তার নিচে দেখা যায় শিবলিঙ্গ যা পাতলা করে বসানো। এর নিচে রয়েছে বিরাট পদ্মফুল ও তার নিচে রয়েছে কোরানের বাণী এবং তারও নিচে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের অলংকরণ এবং দুইপাশে দুটি বড় বড় পদ্মফুল। এই চিত্রকলা যেমন বিস্ময়কর তেমনি আরো বিস্ময়কর শিবলিঙ্গ, পদ্মফুল এবং কোরানের বাণীর সহাবস্থান। এটি যদিও মসজিদ, তবু এর স্তম্ভের নকশাগুলির অমিল দেখে খুব ভালভাবেই বোঝা যায় যে এই মসজিদ তৈরির কোন ইঞ্জিনিয়ারিং পরিকল্পনা ছিল না। তাছাড়া আরো বোঝা যায় যে, হিন্দু বৌদ্ধ এবং জৈন মন্দিরের পাথরগুলি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, সেই পাথরগুলি কোন ভাঙ্গা মন্দির থেকে এনে ব্যবহার করা হয়েছে।

আবিদ আলির মতে, আদিনা মসজিদ আসলেই একটি মসজিদ, যা সুলতান সিকান্দার শাহ ১৩৬৪ থেকে ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বছর ধরে তৈরি করান। কিন্তু এটি সেভাবে সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা নয়। এর বিভিন্ন অংশ হিন্দু মন্দির থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু আদিনা মসজিদ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। তার কারণগুলি হলো -

প্রথমত, আদিনা মসজিদ গঠন কাঠামোর মধ্যে বিতর্কিত 'বাদশাহ কি তখৎ'-এর অবস্থান। বাদশাহ কি তখৎ মানে রাজসিংহাসন। কিন্তু এটি কোন সিংহাসন নয়। বরং এটি মাটি থেকে আট ফুট উঁচু একটি ব্যালকনির মতো অনেক বড়ো স্থান। এটির নাম কেন এমন- এই বিষয়ে কোনও ঐতিহাসিক স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। আবিদ আলি বলেছেন ''ইসলামী ইবাদত (উপাসনা)-এর স্থান মসজিদে এরূপ একটি স্বতন্ত্র কুঠুরি থাকা নিতান্তই অশোভন''। আসলে মুসলমানদের উপাসনার স্থলে কি বাদশাহ আর প্রজা, সকলেই সমান। তাই মসজিদে ব্যবধান রাখা পৃথক স্থান কল্পনাও করা যায় না। ''এমনকি বাংলার বাইরে ভারতের অপর কোথাও কোনও মসজিদে বাদশাহ কি তখৎ বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নাই''। তবু তিনি এই স্থাপত্যটিকে মসজিদ বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

দ্বিতীয়, যে বিষয়টি চোখে পড়ার মতো, তা হলো, বাদশাহ কি তখতের পশ্চিম পাশের দেওয়ালে কালো পাথরের মিহরাব আছে তার চারপাশে কারুকার্য। এরকম কালো পাথরের সূক্ষ কারুকার্যের মধ্যে স্বস্তিক চিহ্ন চোখে পড়ার মতো। এবং তার পাশে যে ইসলামিক শিলালেখ আছে তা কোরান থেকে নেওয়া। এবং তার সূক্ষ্মতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম, এবং তুলনামুলকভাবে নবীনতর। আবিদ আলির মতানুসারে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, হিন্দু চিহ্নাঙ্কিত পাথরগুলি অন্য হিন্দু মন্দির থেকে নেওয়া হয়েছে, তাহলে বাদশাহ কি তখতের পাশের পশ্চিমের দেওয়ালে টেরাকোটার

কারুকার্যে যে স্বস্তিকা রয়েছে, তাঁর ব্যাপারে তিনি তাঁর বইতে বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেন নি কেন?

নামাজঘরের অর্থাৎ মসজিদের মূল কক্ষের পশ্চিমদিকের দেওয়ালে দুটি বড়ো আকারের প্রস্ফুটিত পদ্মফুল দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলি আমরা প্রাচীন হিন্দু মন্দিরগুলিতে সর্বত্রই দেখে থাকি। পদ্ম হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত পবিত্র প্রতীক হিসাবেই গণ্য করা হয়। মূল কক্ষের বাইরেও বাদশাহ কি তখৎ এবং সিকান্দারের কক্ষেও এরকম অনেকগুলি পদ্মফুল পাওয়া যায়। এছাড়াও মসজিদের মধ্যে আরো এমন বেশ কয়েকটি ছোট পদ্মফুল লক্ষ্য করা যায়। আবিদ আলীর মতে এগুলি সম্ভবত কোনও হিন্দু মন্দির থেকে সংগ্রহ করে আনানো হয়েছিল। কিন্তু এই বড় পদ্মফুলগুলি বাইরের কোনও হিন্দু মন্দির থেকে তুলে আনিয়ে লাগানো অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে হলেও ছোট পদ্মফুলগুলি অন্য মন্দির থেকে তুলে আনিয়ে লাগানোটা একেবারেই অযৌক্তিক ঠেকে। তাই অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রস্ফুটিত পদ্মগুলি আদি থেকেই ওই প্রাঙ্গণের অংশ ছিল।

এবার আমরা যদি কিবলা আর মিহরাবের দিকে চোখ ফেরাই, তাহলেও অসংগতি চোখে পড়ে। কিবলা এবং মিহরাব মসজিদের গঠন কাঠামোর একটি অপরিহার্য অংশ। কিবলা বলতে বোঝায় মসজিদের নামাজঘরের কারুকার্য করা দিক। এটি নির্দেশ করে যে কোন দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে হবে। আর তার মধ্যে থাকে মিরহাব। মিরহাবের অর্থ হল নামাজঘরের ভিতরের এমন জায়গা যেটি কাবাঘরের সর্বাধিক কাছে। এটি কাবাঘরের দিকে ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ এটি কাবার দিকে (পশ্চিমদিকে) মসজিদের সর্বাগ্র অংশ। এখানে ইমাম নামাজে নেতৃত্ব দেন। এটি দেখতে অনেকটা কুলুঙ্গির মতো। যেহেতু এটা খুব ইঙ্গিতপূর্ণ স্থান তাই এর পশ্চিমে অন্য কোন স্থান বা কক্ষ থাকা উচিত না। কিন্তু এখানে সিকান্দারের কক্ষটি এমন স্থানে যা নিয়ম লঙ্ঘন করে। তাছাড়া আবিদ আলির দাবী 'সিকান্দারের কক্ষ বাদশাহ আসলে তাঁর সহচরদের বিশ্রামকক্ষ' যদি সত্য হয় তাহলে একমাত্র ওই স্থান থেকে বাদশাহ কি তখতে যাওয়ার পথ করা হল কেন, যা কিনা আবিদ আলির মতে 'নারীগণের নামাজের স্থান'? এটি ইসলামী রীতির সঙ্গে চূড়ান্ত অসঙ্গতিপূর্ণ। আরো একটি বিষয় যা মসজিদের গঠন কাঠামোয় অপরিহার্য্য, তা হল নামাজের স্থানে পর্যাপ্ত আলো। কিন্তু বাদশাহ কি তখৎ দিনেও প্রায় রাতের মতোই অন্ধকার থাকে। বস্তুতপক্ষে, আবিদ আলি খান সাহেব ওটাকে নারীদের জন্য পৃথক নামাজের জন্য স্থান বলে আন্দাজ করলেও তেমন কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি দেন নি।

এটিকে মসজিদ দাবী করার পক্ষে সবচেয়ে আপত্তিকর হলো ভিতরে থাকা একটি বেদী, যা কবর বলে দাবী করা হয়। কিন্তু মসজিদের ভিতরে কোন মানুষকে দাফন করা তো ইসলামী রীতির চূড়ান্ত বিরোধী এবং ইসলামী দৃষ্টিতে অপরাধস্বরূপ। তাহলে সেটিকে কবর হিসাবে ধরা যায় কি করে? একে অনেকে সিকান্দার শাহের কবর বলে থাকেন। কিন্তু আবিদ আলি সাহেব নিজেই সেই বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। এই প্রসঙ্গে আবিদ আলির সাহেবের দাবী 'স্থানীয় লোকেরা বলে থাকে যে, মসজিদটা যখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল তখন জনৈক ফকির সেখানে বাস করতেন। ফকিরের মৃত্যুর পর তার শিষ্যরা তাকে মসজিদের প্রধান কক্ষের পশ্চিমদিকে খিলান করা স্থানে দাফন করে।' কিন্তু সেখানে কোন ফকির থেকে থাকলে এবং তার অনুগামীরা সেখানে যাতায়াত করে থাকলে স্পষ্টতই সেই স্থান তখনো পরিত্যক্ত হয়নি। সেক্ষেত্রে মুসলিমদের দ্বারা মসজিদের মধ্যে দাফন হতে পারে কি?

এরপর যে মূল প্রশ্নটি উঠে আসে, সেটি হল, সিকন্দর শাহের মতো সুলতান, যিনি ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে আরব ও পারস্যের সুলতানদের মধ্যে যোগ্যতম এবং পরে 'মুসলিমদের খলিফা' বলে ঘোষণা করেছিলেন, তার পক্ষে এমন একটি মসজিদ স্থাপন করা সম্ভব কিনা যার দেওয়ালে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত বা খোদিত থাকবে (বাংলাপিডিয়া)। বিশেষত তিনি যখন গোঁড়া মুসলিম ছিলেন এবং হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করতেন (আবিদ আলি খান)। মন্দিরগাত্রে বহু স্থানে হিন্দু দেবী দেবতা, যেমন গণেশ, বিষ্ণু, হনুমান, দুর্গা ইত্যাদি উৎপাটিত, ক্ষতবিক্ষত বা অক্ষত অবস্থায় বর্তমান।

খান সাহেব আবিদ আলি খান মহাশয়ের লেখনীকে আমাদের পক্ষপাতমুক্ত বা নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। যে স্থাপত্য বিষয়ে মুসলিম এবং হিন্দুদের মধ্যে টানাপড়েন এখনো অবধি সমানতালে চলে আসছে, যে বিষয় নিয়ে নিয়মিত আইন আদালত করে চলেছেন দুই পক্ষ- সেই বিষয়ে নিষ্ঠাবান মুসলিম খানসাহেব আবিদ আলি খান মুসলিমদের পক্ষ নেবেন সেটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া উনি এই বিষয়ের গবেষকও নন। তার রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল- কোটি ইংরাজি নামাজ শিক্ষার বই, একটা উর্দু ও পার্সী গজলের বই এবং উর্দু এবং বাংলায় দুটি শিশুদের প্রথম শিক্ষার বই। এমনকি খান সাহেব আবিদ আলি যার ছাত্র

ছিলেন সেই বিখ্যাত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর লেখা 'গৌড়ের ইতিহাস' নামক অত্যন্ত সমাদৃত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে অনেক বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করলেও দ্বিতীয় খণ্ডে আদিনা বিষয়ে একটি অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে সমস্ত বিতর্ক এবং ইতিহাস এড়িয়ে গেছেন দেখে অবাক হয়েছিলাম। হতাশও হয়েছিলাম এরকম একটি বই থেকে কোন সাহায্য না পেয়ে। কিন্তু পরে খেয়াল করলাম দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশ হয়েছিল খান সাহেব আলি খানের অর্থে- সেখানে আদিনা বিষয়ক সত্য থাকবেনা এটাই স্বাভাবিক। আদিনা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্য যে আজ অবধি প্রতিনিয়ত পরিকল্পনামাফিক লোপাট করা হচ্ছে- খান সাহেবও সেই একই অপরাধে অপরাধী ছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে দেখলাম রজনীকান্ত চক্রবর্তী আমাদের ততটাও হতাশ করেন নি। প্রবাসী পত্রিকায় 'পান্ডুয়া ভ্রমণ' নামক রচনায় তিনি লিখেছেন, ''আমি সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে একবার পান্ডুয়া দেখিতে গিয়াছিলাম.....তখন আদিনার ভিতর বিস্তর হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দিয়া খচিত নামাজের স্থানে উঠিবার সোপান দেখিয়াছিলাম। যেমন মসজিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থলিত হইতেছিল, অমনি মুসলমান ভয়ে লুক্কায়িত গণেশ কার্ত্তিকেয় কৃষ্ণ বিষ্ণু বাহির হইয়া পড়িতেছিল। সে সকল মূর্তির নাক প্রায় ভাঙ্গা ছিল। বেচারা কালাপাহাড়ের উপর তার কারণ অর্পিত হইত। এখন সে সকল মূর্তি দেখা গেল না। কোথায় গেল?''

প্রসঙ্গত, সরকারী ফলকে তাকে সিকান্দার শাহের তৈরি মসজিদ হিসাবে উল্লেখ করা হলেও এই বিষয়ে গবেষক অধ্যাপক ডঃ সুস্মিতা সোম একমত পোষণ করেন না। তিনি সিকান্দার শাহকে এর নির্মাতা না বলে 'সংস্কারক' বলে মনে করেছেন। তিনি লিখেছেন, ''সুলতান ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ এই মসজিদটির নির্মাতা বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। যদিও এটির প্রকৃত স্থাপত্যকাল এবং প্রকৃতপক্ষে এটি কি ছিল সেই বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষকদের অনুসন্ধিৎসা কৌতূহল এবং বিতর্কের অবসান হয়নি আজও.... শোনা যায় আদিতে এটি জৈন পথপ্রদর্শক আদিনাথের মন্দির ছিল। পরে পরিণত হয় বৌদ্ধ বিহারে। কেউ বলেছেন এখানে একটি বিশাল মন্দির তৈরির কাজ শুরু হয়। শেষ হওয়ার আগেই মুসলমান এই প্রদেশ আক্রমণ করে ফলে তখন কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে মুসলমান বদশাহের আদেশে ঐ মন্দির তৈরির কাজে জোগাড় করা মশলাগুলি ব্যবহার করে ইমারতটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়।'' অন্যত্র তিনি লিখেছেন, ''দ্বাদশ শতাব্দীর একটি লিপি যা এখানে পাওয়া গেছে তার পাঠোদ্ধার করেছেন শ্রী দীনেশচন্দ্র সরকার। এই লিপিটির আটটি অক্ষরের শেষ দুটি অক্ষর হলো 'শ্রীউতঙ্ক শিবাঃ' অর্থাৎ এটি উতঙ্ক নামীয় কোনও ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের লিপি। এছাড়া আদিনা মসজিদের পূর্ব প্রবেশ পথ, যা উত্তর দিকে রয়েছে, সেটি একটি মন্দিরের গর্ভগৃহ বলেই মনে হয়, যা হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী পূর্বমুখী। শুধু তাই নয়, ভগ্ন শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয়েছে বাদশাহি তক্তপাশের কোষ্ঠিপাথরের অলঙ্কার করা দেয়ালের উপরিভাগে। শিবলিঙ্গ বিহীন গর্ত সহ একটি গৌরীপট্টও অবহেলিত অবস্থায় পাওয়া যায় মসজিদ চত্বরেই। দুটি গণেশ মূর্তি সহ অক্ষত দুটি দ্বার আদিনা মসজিদের পূর্ব এবং পশ্চিমের প্রাচীরে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া পশ্চিমদিকের বাইরের দেওয়ালে একটি পত্রাকৃতি খাঁজকাটা চৈত্যগবাক্ষও দেখা যায়। দুটি আয়তাকার লম্বা স্তম্ভের উপর রাখা এর শীর্ষদেশও মন্দিরের মতো। এর শিকড়টি একটি বসানো কুঁড়ির অর্ধাংশের মতো। স্তম্ভ দুটিতে সুন্দর কারুকার্য। এর মাঝখানে কোনও মূর্তি ছিল যা বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এছাড়াও সমগ্র মসজিদটির পূর্ব নির্মিতির গায়ে বহু জৈন বৌদ্ধ প্রতীক চিহ্ন রয়েছে। আসলে পাল সেন আমলের বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির অনেকটাই ধারণ করে আছে এই সৌধ।''

কিন্তু ডঃ সোমের সিদ্ধান্তে অসঙ্গতি চোখে পড়ে যখন তিনি বলেন, ''মসজিদ তৈরির সময় পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী না হলেও সৌন্দর্য বা সুরক্ষা যে কোনও কারণেই হোক থেকে গেছে এইসব অলঙ্করণে।'' মসজিদ পর্যবেক্ষণের সময় আমাদের মনে হয়েছে, যদি সিকান্দার শাহ ভগ্ন হিন্দু মন্দির থেকে প্রস্তর খণ্ডগুলি তুলে এনে মসজিদে স্থাপন করে থাকেন, তাহলে তার মাত্র দুটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে- সৌন্দর্য অথবা সুরক্ষা। যদি কারুকার্যের প্রতি মুগ্ধ হয়ে সেগুলি এনে মসজিদে স্থাপন করে থাকেন, তাহলে সেই কারুকার্যের তিনি ভাঙতে যাবেন কেন? তাতে তো সেই সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয়ে তার উদ্দেশ্য নষ্ট হবে আর যদি মসজিদকে সুরক্ষা প্রদান অর্থাৎ মজবুতি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রস্তরগুলি আনিয়ে স্থাপন করেন, তাহলে সেগুলি মসজিদের দেওয়ালের বাইরের দিকে দৃষ্টিযোগ্য অবস্থায় রাখা হলে তো মসজিদের উদ্দেশ্যেই ক্ষুণ্ণ হবে। তাছাড়া সেটা তো সিকান্দার শাহের চরিত্রের সাথে খাপ খায় না।

বাস্তবিকপক্ষে, আদিনায় অমুসলিম কারুকার্যগুলি বাদ দিলে কয়েকটি কোরানের খোদিত আয়াত ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন কারুকার্য দেখতে পাওয়া যায়না। তাই, যদি ধরেই

নেওয়া হয় যে, মসজিদের বাকি অংশ অর্থাৎ মূল কাঠামো সিকান্দারের তৈরি, তবু কেবল কাঠামোটি তৈরিতে 'দশ বছর' সময় লাগাটা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। এরপরও তাতে এতখানি পরিকল্পনার অভাব চোখে পড়াটা কি বিসদৃশ নয়? এই সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করে তাকে অমুসলিম স্থাপত্য মেনে নিতে দ্বিধা নেই। কারুকার্যগুলিতে হিন্দু-বৌদ্ধ মিশ্র রীতি দেখে সেই স্থাপত্য হিন্দু পাল-সেন যুগের কোনও হিন্দু মন্দির বলেই মনে হয়। সন্দেহ নেই, বিভিন্নভাবে সরকারী কর্মচারী এবং স্থানীয় মুসলিমদের কোন একটি চক্রের দ্বারা প্রতিনিয়ত অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে আদিনার হিন্দু অতীতের তথ্যপ্রমাণগুলি লোপাট করা হচ্ছে- রজনীকান্ত চক্রবর্তীর প্রবাসী পত্রিকার রচনা তার প্রমাণ। সেখানকার হিন্দুদের মধ্যে ক্ষোভ, ইদানীং পাণ্ডুয়ার মেলার সময় মুসলিমরা শয়তানকে পাথর ছোঁড়ার নামে আদিনার গায়ে থাকা হিন্দু মূর্তিগুলিতে ইট পাথর ছুঁড়তে শুরু করেছে। তাদের মতে, এটিও প্রমাণ লোপাটের প্রচেষ্টার অঙ্গ। একাধিক মূর্তির গায়ে আমরা এরকম ইটের দাগ দেখতে পেয়েছি। ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক অধিগৃহীত হেরিটেজ ঘোষণা করে সরকারি সংরক্ষণ সত্ত্বেও সর্বসমক্ষে প্রতিরোধহীন ভাবেই চলছে এই ধরণের বেআইনি কাজ। ২০০৫ সালে পাণ্ডুয়ার হিন্দুদের পক্ষে 'বৈদিক হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি জাগরণ মঞ্চ'-এর তরফ থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি স্মরকলিপি দেন। সেই স্মারকলিপি অনুসারে, পাণ্ডুয়ায় সদ্যনির্মিত বহুতল মাদ্রাসার পরিচালনায় মুর্শিদাবাদ, কালিয়াচক, কিষাণগঞ্জ ইত্যাদি এলাকা থেকে ট্রাক বাস ইত্যাদিতে করে লোক এনে হিন্দু এবং ভারত বিদ্বেষী আওয়াজ তুলে সঙ্গে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে হিন্দুদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে।

পরিশেষে পাণ্ডুয়ার বর্তমান পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য আমরা স্মারকলিপি এবং সরকারী তথ্য থেকে প্রাপ্ত দুটি বিষয়ের উল্লেখ করে নিবন্ধে ইতি টানবো। প্রথমটি হল, বিগত ২০০১ সালে পেন্টাগন এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হানার তিনদিন পর, ১৪ই সেপ্টেম্বর পাণ্ডুয়ায় ১০-১২ হাজার মুসলমানের জমায়েত করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল পাণ্ডুয়া এবং আদিনার সৌধে নামাজ পড়া এবং ইসলামী দখলদারি নেওয়া। তাঁরা পাণ্ডুয়াতে নামাজ পড়তে সক্ষম হলেও আদিনায় তাঁরা স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণ এবং সৌধের গার্ডদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে নামাজ পড়তে পারেনি। শেষে তাঁরা পরবর্তী জুম্মার অর্থাৎ ২১শে সেপ্টেম্বর তাঁরা আবার এসে নামাজ পড়ার এবং দখল নেওয়ার হুমকি দেয়। কিন্তু সেইদিন পুলিশ সুপার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তৎপরতায় র‍্যাফ নামিয়ে মুসলিমদের রুখে দেওয়া যায়। কিন্তু সাধরণ মানুষের মধ্যে আজও আতঙ্ক আছে। আর দ্বিতীয়টি ঠিক আদিনা সম্পর্কে না হলেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সেটি হল এলাকার সচেতন কিছু মানুষের উদ্যোগে পাণ্ডুয়া এবং দেওতলা মৌজার একাধিক সরকারী সি. এস. রেকর্ড এবং আর. এস. রেকর্ড (যেমন- পাণ্ডুয়া মৌজা, জে এল নং-৩৩, খঃনঃ-১/২, দাগ নং-২৫০; দেওতলা মৌজা, জে এল নং- ১৭২, খঃনঃ-১/২, দাগ নং-৪৭৫) উদ্ধার করা গেছে, যেগুলি ১৯৭৫ বা তার আগের। সেখানে যে স্থান মন্দির, হিন্দু জনসাধারণের ব্যবহার্য বলে উল্লেখ রয়েছে অথচ খুব রহস্যজনকভাবে বর্তমান সরকারী রেকর্ডে সেগুলি ওয়াকফ এস্টেটের সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হচ্ছে। বলাবাহুল্য, সরকারি কর্মচারীদের একাংশ কর্তৃক এই রেকর্ডের অনধিকার পরিবর্তন (record tamper) ঘটানো হয়েছে। পাণ্ডুয়ার জমির বর্তমান রেকর্ড এমন একজনের নামে যে ভারতের নয় বরং বাংলাদেশের নাগরিক। যাই হোক এলাকার সচেতন হিন্দুদের মতে, এই ব্যাপারটি খালি পাণ্ডুয়া বা দেওতলার মধ্যেই বা একটি দুটি জমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সারা মালদহের হিন্দু দেবোত্তর সম্পত্তিগুলি এভাবেই গ্রাস করে নেওয়া হচ্ছে, ওয়াকফের বা কোন মুসলিম ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে দখল করা হচ্ছে।

যাই হোক, পাণ্ডুয়া সম্পর্কে এখনো অনেক কিছু বলার রয়ে গেল। সেসব আলোচনা পরে অবশ্যই করবো, তবে পাঠকবর্গকে আমার একান্ত অনুরোধ, প্লিজ সেখানে যান এবং সেখানে প্রতিনিয়ত যে নীরব এবং সরব আগ্রাসন চলে আসছে তা নিয়ে কলম ধরুন- জনমত গড়ে তুলুন।

তথ্যসূত্র-
১) পর্যবেক্ষণে গৌড় ও পাণ্ডুয়া- আখতার হোসেন
২) গৌড় পাণ্ডুয়ার স্মৃতি- খান সাহেব আবিদ আলি খান
৩) মালদহ জেলার ইতিহাস- প্রদ্যোত ঘোষ
৪) মালদহঃ ইতিহাস-কিংবদন্তী- ডঃ সুস্মিতা সোম
৫) প্রবাসী পত্রিকা- আশ্বিন, ১৩০৮
৬) বাংলাপিডিয়া ঃ আদিনা মসজিদ

পরাভূত জাতির মহানায়ক

অমিত মালী

এই বাংলায় এখন হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণবদের খুব বাড়বাড়ন্ত। চারিদিকে শুধু 'জয় রাধে' ভাব। মুখে আর কৃষ্ণ নাম একটুও অবশিষ্ট নেই শুধুই 'জয় রাধে'। আর সময় পেলেই ভোগ-উৎসব। তবে এই ভোগ-উৎসবে একটা ব্যাপার খুবই যন্ত্রণাদায়ক- তা হল এদের ছোঁয়াছুয়ি। ভোগের রান্না, পরিবেশন এবং মহাপ্রসাদের বিতরণ সবই এরা নিজেরা করেন। অন্য কেউ যদি ছুঁয়ে দেন, তবে সর্বনাশ। আপনার পূর্বপুরুষদেরকে স্বর্গ থেকে বের করে দেওয়া হতে পারে। আর আপনি যদি ভক্তিভরে কোন একজনকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে ফেলেন; রাধারানীর দিব্যি দিয়ে বলছি, আপনার বাড়িতে খাবেন না। ঘৃণার সঙ্গে আপনার বাড়ি ত্যাগ করবেন। মুখে রাধার নাম নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে এরা জাত-পাত, ঘৃণা-বিদ্বেষ ব্যাপকভাবে ফিরিয়ে এনেছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর সবাইকে কাছে টেনে নেওয়ার শিক্ষা, উচ্চ-নীচ ভেদ না করা- এইসব গ্রহণ করতে পারেনি; তবে রাধাকে ছাড়া। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সত্যিই কি এটাই চেয়েছিলেন? কেমন ছিলেন তিনি? কেমন ছিল হরেকৃষ্ণ আন্দোলন? কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত ''চৈতন্যচরিতামৃত'' তে পাই।

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রথম ব্যক্তি যিনি এই বাংলায় প্রথম কৃষ্ণনাম প্রচার করেন। তিনি এই কৃষ্ণনাম প্রচারকে জন আন্দোলনে রূপ দেন। তিনি কৃষ্ণনাম ও নগর সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে ঝিমিয়ে পড়া হিন্দু সমাজে প্রাণসঞ্চার করেন। আর এর ফলে জাতপাতে দীর্ণ এবং ছোঁয়াছয়িতে আক্রান্ত হিন্দুসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আর ঠিক এই কারণে হিন্দুদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছিল। আর এই কারণে মহাপ্রভুর নগর সংকীর্তনকে মুসলমানরা কখনই মেনে নেয়নি। তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নগর সংকীর্তন বন্ধ করেননি। কারণ তিনি কাপুরুষ ছিলেন না। তবে এটা হওয়াও অসম্ভব নয় যে তিনি 'রাধানাম' গ্রহণ না করার জন্যই কাপুরুষ ছিলেন না।

বাংলায় তখন ইসলামিক শাসন। ইসলামিক শাসনের চাপে ও গোঁড়া ব্রাহ্মণদের ঠেলায় তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের তখন ত্রাহি ত্রাহি রব। সেইসময় ব্রাহ্মণ সন্তান চৈতন্যদেব ঘোষণা করলেন, যাগযজ্ঞ নয় কৃষ্ণনামই কলিযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ। এতে ব্রাহ্মণরা খুশি না হলেও যখন একের পর এক গ্রাম নগর সংকীর্তনে যোগ দিতে আরম্ভ করল, তখন ব্রাহ্মণদের আর কিছু করার ছিল না। এছাড়াও মহাপ্রভু ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত অনেককে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনলেন। আর সম্ভবত এই কারণে স্থানীয় মুসলমানরা চটে যায় এবং তারা দলবদ্ধভাবে কাজীর কাছে মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে নালিশ করে- ''মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্তন মহাধ্বনি/ হরি হরি বিনা অন্য নাহি শুনি/ শুনিয়া সে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন/ কাজী পাশে আসি সব কৈল নিবেদন'' (আদিলীলা, চৈতন্যচরিতামৃত)। এতে চাঁদকাজী (মতান্তরে চাঁদ মহম্মদ) রেগে যান এবং সংকীর্তনের মৃদঙ্গ , খোল-করতাল ভেঙ্গে দেন। চাঁদ কাজী হুমকি দেন যে আর কেউ যেন কৃষ্ণনাম না করে এবং কেউ যদি কৃষ্ণনাম করে, তবে চাঁদ কাজী তার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেন; এমনকি তার ধর্মও- ''আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইনু/ সর্বস্ব দন্ডিয়া তার জাতি সে লইমু'' (আদিলীলা)। মুসলমান শাসকের এই অন্যায় এবং ধর্মচারণে বাধা- এটাকে মহাপ্রভু কখনই বর্তমানের মোটা চামড়ার বৈষ্ণবদের মত মেনে নেননি। তিনি নবদ্বীপের আশেপাশের অনেকগুলি গ্রামের হিন্দুদের, যেমন-পারডাঙ্গা, গাদিগাছা ইত্যাদি গ্রামের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং নগর সংকীর্তনের নির্দেশ দেন। এখানে মহাপ্রভুর সংগঠক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মহাপ্রভু নিজে মিছিলের সামনে থাকবেন বলেন। কিন্তু কী হয়েছিল সেদিন? নির্দিষ্ট দিনে চৈতন্যদেব সবাইকে কীর্তন করার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি যবন অর্থাৎ মুসলমানদেরকে সংহার করার সংকল্প দিলেন- ''প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্তন। মুঞি সংহারিমু আজি সকল যবন।'' নগর সংকীর্তন এগোতে লাগল বিশাল সংখ্যক হিন্দুসহ। এই

অবস্থায় মুসলমান কাজী ভয় পেয়ে বাড়ীর কোন এক স্থানে লুকিয়ে পড়েন- ''কীর্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে। তর্জন গর্জন শুনি না বাহিরে।'' ক্রুদ্ধ হিন্দুরা কাজীর ফুলের বাগান, ঘরদোর ভাঙচুর করেন। পরে মহাপ্রভু নিজে কাজীকে ঘর থেকে বের করে আনেন এবং দুজনের মধ্যে তুমুল যুক্তিতর্ক শুরু হয়। চৈতন্য মহাপ্রভু চাঁদকাজীকে গোহত্যা বন্ধ করার আদেশ দেন এবং বলেন যারা গোহত্যা করে তারা লক্ষকোটি বছর 'রৌরব' নামক নরকে কাটায়- ''প্রভু কহে বেদে গোবধ নিষেধ/ অতএব হিন্দু মাত্র না ধরে গোবধ/ জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী/ বেদ পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা বাণী।'' যুক্তিতর্কে চাঁদকাজী পরাজিত হন। ''বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি।''এছাড়াও চৈতন্যদেব তাঁর শিষ্যদের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া মন্দির ও তীর্থস্থানগুলি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চৈতন্যদেবের শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে গোপাল মূর্তি উদ্ধার করেছিলেন। আর এক শিষ্য সনাতন গোস্বামী, যাকে হুসেন শাহ বন্দি করেছিলেন, তিনি মথুরায় অনেকগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির ও মূর্তি উদ্ধার করেন।

কিন্তু এরকম একজন ব্যক্তির জীবন যথেষ্ট রহস্যময়। আর এক্ষেত্রে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থেও কোন সমাধানসূত্র নেই। 'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুযায়ী মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করেন কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে। এরপর তিনি আর কখনও নবদ্বীপে ফেরেননি। তিনি অদ্বৈত আচার্যের গৃহে কিছুকাল থাকার উদ্দেশ্যে শান্তিপুরে যান। কেন তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন? কারণ মুসলিম শাসক হুসেন শাহ ও মহাপ্রভুর বিরোধ। এই কারণে মহাপ্রভু নবদ্বীপ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং আশ্রয় নিয়েছিলেন হিন্দুরাজ্য উড়িষ্যায়। উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র ও তাঁর সভাপন্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন মহাপ্রভুর ভক্ত। কিন্তু হুসেন শাহ হাল ছাড়েননি। তিনি মহাপ্রভুর শিষ্য সনাতন গোস্বামীকে বন্দি করেন এবং উড়িষ্যা আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সনাতন গোস্বামী কারারক্ষীকে ঘুষ দিয়ে পালিয়ে যাওয়ায় তাঁর এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তবে মুসলমান শাসকের চক্রান্তে মহাপ্রভুকে হত্যা করা হয়েছিল, একথা একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ ভারতভ্রমণ সম্পূর্ণ করার পর মহাপ্রভু পুরীতে ফিরে আসেন এবং শেষ আঠারো বছর তিনি পুরীতেই ছিলেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি কাটিয়েছিলেন কাশীশ্বর মিশ্রের আশ্রম গম্ভীরাতে। এইসময় তিনি অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতেন। হত্যার চক্রান্তের কারণেই মহাপ্রভুকে এই গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতে হত এবং মহাপ্রভুর সমাধি না পাওয়ায় এ তত্ত্ব আরও জোরালো হয়েছে। আর একটি অনুমান যে পুরীর জগন্নাথদেবের পাণ্ডারাই মহাপ্রভুকেই হত্যা করে মন্দিরের মধ্যেই কোনস্থানে অথবা দেওয়ালে গেঁথে দিয়ে তাঁর দেহকে লুকিয়ে ফেলে। এই অনুমানগুলির মধ্যে যেটাই সঠিক হোক না কেন, ভন্ড বৈষ্ণব প্রচারিত জগন্নাথদেবের দেহে লীন হয়ে যাওয়ার গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যে। মহাপ্রভুর মৃতদেহ লোপাট করে ফেলাও অসম্ভব নয়। চৈতন্যদেবের মৃত্যু নিয়ে নানা মত এই রহস্যকে আরও জটিল করেছে। উড়িষ্যার লেখক জয়ানন্দের লেখা 'চৈতন্যমঙ্গল' বইতে আছে, রথযাত্রাকালে নৃত্যরত মহাপ্রভুর পায়ে পাথরের টুকরো ফুটে যাওয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে মারা যান। আবার কারো মতে পুরীর সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে জলমগ্ন হয়ে চৈতন্যদেবের মৃত্যু হয়। কিন্তু এগুলি সঠিক হলে, চৈতন্যদেবের সমাধি কোথায়?- কারণ গজপতি প্রতাপরুদ্র ছিলেন মহাপ্রভুর ভক্ত, যিনি মহাপ্রভুর জন্য হুসেন শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। তাই চৈতন্যদেবের সমাধি না পাওয়ায় গুপ্তচর দিয়ে চৈতন্যদেবকে হত্যার বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

কাশ্মীরের ব্যাপারে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদ থেকে শুরু করে অনেকেই বোঝাতে চেয়েছেন কাশ্মীরের সমস্যা হিন্দু মুলমান সমস্যা নয়, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা। বেছে বেছে হিন্দু হত্যা, হিন্দু মন্দির ধ্বংস, হিন্দু বিতাড়ন দেখেও প্রকৃত সত্য কেউ উচ্চারণ করছেন না। মৌলভী ফারুকের মত দুচারজন মুসলমান মরছে ঠিকই, সেটা কিন্তু তাদের ভারতপ্রীতির জন্য নয়। ওটা হচ্ছে পাকিস্তানপন্থী এবং স্বাধীন কাশ্মীরপন্থীদের আভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের ফল। ভারত কিন্তু দুপক্ষেরই সমান দুশমন। —শিবপ্রসাদ রায়

পুজো তো আসে না

দ্বৈতা হাজরা

বাবার হাতের পাতা কত বড়ো
ঠিক যেন ছাত হয়ে যায়
বাবার গায়ের রং মাটি মাটি
ঠিক যেন ঘরের দেওয়াল
বাবার মুখের হাসি
চুপিসারে বলে দেয় পুজো এসে গেছে।

বাবার চোখের আলো অমলিন
বলে দেয়, আজ মহালয়া
বাবার গায়ের জামা এক আছে,
ঘাসে ভেজা রং জ্বলে গেছে
কত পুজো আসে যায়,
মানুষটা কোনোদিন
কিছুই কেনে না।

বাবার পায়ের পাতা
বৃষ্টিতে রোদে, ঝড়ে কখনো থামেনি
সেই তো পুরনো চটি
আজীবন পায়ে তার দাগ রয়ে যায়
বাবার গলার স্বর
আগমনী গান যেন বুকের ভেতরে
মহালয়া আসে যায়
বাবা চলে গেলে পরে
পুজো তো আসে না।..

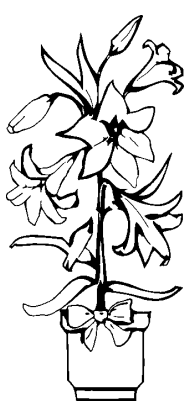

জীবনযুদ্ধ

সুন্দর গোপাল দাস

জীবনযুদ্ধ কাকে বলে জানিনা
কলের জল খেয়ে সকাল কাটে
আর, শিয়ালদহ স্টেশনে রাতটা।
বাবুরা হেঁকে ওঠে, কুলি- ওই কুলি
দুটো সওয়ারী পেলে
জোটে দুমুঠো মুড়ি-
দিন আনি দিন খাই, দিবারাত কিছু নাই
এইভাবে কেটে যায় জীবনটা।
জেগে থাকি সারারাত ঘুমকে নিয়ে
ভোরের প্রথম মেল আসবে যাত্রী নিয়ে
ট্রেন এলে এক ছুটে
দাঁড়াই সেলাম ঠুকে-
বলি, বাবু, আপনার কুলি চাই?
মাথায় বেডিং তুলে দুহাতে ঝোলা দোলে
পৌঁছে দিলে পরে, পাঁচ টাকা পাই।
প্রতিদিন এক খেলা হাজার যাত্রী মেলা
কেউ কারো চেনা বা জানা নয়।
তাড়াতাড়ি ছোটে সব
অফিস কি আদালত-
সময়ে না পৌঁছালে বকুনির ভয়।
আমাদের সময়ের নেই কোন দাম যে
জীবন আমাদের ছন্নছাড়া।
সবাইয়ের গাল খাই তবু মাল বয়ে যাই
আমরা সবার থেকে লক্ষীছাড়া।
তবু স্বপ্ন দেখে মন
বাড়ি নয় গাড়ি নয়, ছোট্ট সংসার মনের মতন
ছোট্ট একটা আশা, তুমি আমি ভালোবাসা
সোনালি আলোয় ভরা, ভোরের মতন।।

আগমনী

সমীর গুহরায়

আগমনীর আগমন বার্তায়
খুশীতে ভরে উঠেছে আকাশ
বাতাসেও আজ প্রাণের স্পন্দন
নীলাকাশে ভেসে থাকা ছোট ছোটো মেঘের ভেলা
উড়ে চলেছে নিরুদ্দেশের দেশে
মাঠে মাঠে ফুটে ওঠা কাশফুলের সারি
পৃথিবীর বুকে নিয়ে এসেছে শুভ্রতার স্পর্শ
বর্ণে গন্ধে আজ সর্বত্রই সাজ সাজ রব
ঢাকের সুমধুর শব্দ
প্রাণে তুলেছে আনন্দের হিল্লোল
যেন মা দুর্গা নেমে এসেছেন স্বর্গ থেকে
তাঁর স্পর্শ লেগে মাঠের সোনালি ধান
দুলে উঠেছে খুশীতে
কোন দূর থেকে খেয়া ভাঙা নৌকার
পাটনীর গান ভেসে আসছে
ঘাটে জল আনতে আসা বধূর
আনন্দ উচ্ছ্বাস-
বহুদিন পর আপনজনটির মুখ দেখে
সুখী, সবাই সুখী
দশপ্রহরিণীর স্নেহস্পর্শে কেটে গেছে সব অভিশাপ
সবাই ভেসেছে আজ এক-
নির্মোহ সুখের আনন্দ জোয়ারে।

অলিম্পিকে দীপা

মদন সিংহ

অলিম্পিকে জিমন্যাসিয়াম
দীপা কর্মকার।
বিশ্বমাঝে বিশ্বনাথের
তোমায় আবিষ্কার।
পাওনি পদক যদিও তুমি
তবুও মহীয়ান,
ভারত তোমার কদর বুঝে
করেছে সম্মান।
পুরষ্কারের আনন্দেতে
যাওনি মোটেও মেতে,
বিশ্বমাঝে ভারত জয়ের
স্বপ্ন বুকে রেখে।
আনবে তুমি সোনার পদক
দেখব সবাই মোরা,
বিশ্বলোকে জানবে তুমি
জিমন্যাসিয়াম সেরা।
ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের আশিস
এবার তুমি পাও
স্বপ্ন তোমার হবেই সফল
ভরসা রেখে যাও।

ক্লেদাক্ত জীবন

ময়ূখ ব্যানার্জী

সিগারেটে চুম্বন আর ধোঁয়া ছাড়া নবজাতকের মুখে,
ঠোঁটে ঠোঁটে চুম্বন অবাক দৃষ্টি উদিত কিশোর চোখে।
ঘরের কামুকতা বাইরে এনে হয়েছে কি আধুনিক?
বেকার যুবকের প্রেমের যন্ত্রণায় ভরে গেছে চারিদিক!
পড়েছ তুমি বিদেশী কেতাব আর সংস্কৃতির পাঠ,
তাকিয়ে দেখ গ্রামের ছেলেদের খেটে খাওয়া সেই মাঠ।
ছোটো কাপড়ের তুমি আর তোমার মার্সিডিজ,
বিবস্ত্র গৃহহীনার পেটে আছে শহুরে বাবুর বীজ।
কোনারক আর কামসূত্রে তুমি হয়ে আছো আজও বুঁদ,
নতুন দুনিয়া, শিশু-কিশোর, অকাল কামের অর্বুদ।
অকাল বসন্তে ফুল ফুটে ওঠে বালিকার যোনীতে,
গ্রীষ্মের তাপ সইতে কি পারে অপক্ক মনেতে?
সতীদাহ নেই সভ্য সমাজে খারাপ গিয়েছে বাদ,
দেশের ভালোটা চোখে পড়ে না হয়েছ কি উন্মাদ?

সিরিয়ার ক্যাম্পের সেই মেয়েটি

দেবশ্রী চক্রবর্তী

সে দিনের কথা ভোলার না, শত চেষ্টা করলেও আমি ভুলতে পারি না। বাগদাদ থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে শামারা নামে ছোট্ট এক গ্রাম, যার চারপাশ সারিবদ্ধ হলুদ পাহাড়, বয়ে চলছে নীল নদী আফ্রিন। নদীর পারে সারিবদ্ধ কাঠ বাদামের গাছ, সেই নদীর ধারেই ছিলো আমাদের গ্রাম শামারা। আমার আব্বু কাজ করত খেলনার কারখানাতে, আম্মি আমাদের ৫ ভাই বোনকে আর সংসার সামলাতেই সারা দিন ব্যস্ত থাকতো। কি সুখেরই না সে দিন ছিলো, আমরা তিন বোন আর দুই ভাই সকালে স্কুলে যেতাম। স্কুলটা ছিলো পাহাড়ের গা ঘেঁষে এক ডালিমের বাগিচার ভিতরে। আব্বু আমাদের বাজার থেকে আশমানি রঙ্গের দোপাট্টা এনে দিয়েছিল, তাই দিয়ে মাথা ঢেকে আমরা তিন বোন সুলতান দরজির সেলাই করা হলুদ কুর্তা পাজামা পড়ে স্কুলে যেতাম, ভাইরা পড়ত সাদা পাঠানি কুর্তা পাজামা। কি সুখের না দিন ছিলো, আকাশে আশমানি রঙের মাঝে সাদা কবুতর উড়ত। একবার ছোট ভাইটার কবুতর খাবার খুব ইচ্ছা হয়, আব্বু ওকে বাজারে নিয়ে গিয়ে একটা কবুতর পছন্দ করতে বলে। ও একটা সাদা স্বাস্থ্যবান কবুতর পছন্দ করে বসে। আব্বু ওকে কবুতরটা কিনে দিয়ে কবুতরটা হাতে নিয়ে উড়িয়ে দেয়। ভাই বলে ও আপনি কি করলেন আব্বু? আব্বু বলেন ওর যেখানে স্থান ওকে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম বেটা, দেখতো কত সুন্দর লাগছে ওকে। এই ছিলেন আমাদের আব্বু, মেয়েদের আব্রুর মধ্যে থেকে স্কুলে পাঠাতেন আবার ছেলেমানুষের মতন আশমানে কবুতর ওড়াতেন। আব্বু খুব ওস্তাদ মানুষ ছিলেন। ফার্সী, আরবি সব ভাষা জানতেন। কুরান শরিফ ছিলো তার কণ্ঠস্থ। কাঁচা সোনার মতন রং, দেবদূতের মতন চেহারা, গাঁয়ের মানুষ তাঁকে খুব মান্যি করত। এই দেখ, কথা বলতে বলতে নিজের পরিচয়টাই তো দিতে ভুলে গেছি গো। আমি নাসিফা, আমি ইরাকের এক হতভাগ্য নারী, আজ তোমাদের কিছু কথা বলবো বলে কলম ধরেছি। এত সুখের মাঝেও নিজেকে হতভাগ্য বলছি, কেন বলছি তার কারণ আছে গো, সবটাই বলবো বলে আজ কলম ধরেছি। কি যেন বলছিলাম, হ্যাঁ আমি বলছিলাম আমার গ্রামের কথা। ঈদের সময় পাহাড়ের খাঁজে যখন চাঁদ উঠত, তার রং এসে পড়ত পাহাড়ের গায়ে, মনে হত সোনার পাহাড়ের মাঝে সোনার চাঁদ। সারা গ্রাম মেতে উঠত ঈদের আনন্দে। বিরিয়ানি, গোস্ত, সিমুই, ফিরনির গন্ধে চারদিক ম ম করত। নাচগান আনন্দে আমরা মেতে উঠতাম। এরকমই এক রাতে ওয়াসিম চাচা আব্বুকে ডেকে নিয়ে গেল। গ্রামে কিছু নতুন মানুষ এসেছেন যারা জিহাদের কথা বলছেন। আব্বু বেরিয়ে গেলে আমি আম্মিকে জিজ্ঞাসা করি আম্মি জিহাদ কি। আম্মির মুখে অমাবস্যার ছায়া দেখতে পাই। আম্মি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বিষণ্ন মুখে বাইরে চেয়ে আছে, তার দৃষ্টি ভয়ঙ্কর। কি হলো কিছুই বুঝলাম না।সেদিন রাতে আব্বু অনেক দেরি করে ফিরল। রাতে আম্মি আর আব্বু কথা বলছে শুনলাম, কিন্তু কথা খুব অস্পষ্ট, একটা কথাই কানে আসছিল পরিস্থিতি ভালো না, ছেলে মেয়েদের সরিয়ে দিতে হবে। আম্মি বারাবার বলছিল কোথায় পাঠাবে? তিনকুলে তো কেউ নেই। তার চেয়ে এখানে সবাই এক সাথে আছি এটাই ভালো। এখন থেকে রোজ রাতে মিটিং হয়, আব্বু যেতে না চাইলেও মিটিং-এ জোর করে যেতে হয়। ওয়াসিম চাচা আব্বুকে ডেকে নিয়ে যায়, বলে ওদের কাছে মেশিনগান আছে, না গেলে ঝাঁঝরা করে দেবে।

সেদিন আশমানে সোনার থালার মতন সূর্য উঠেছিল, আমরা তিন বোন জুমর শেখের কাছ থেকে কাঁচের চুরি কিনেছিলাম, সূর্যের আভায় ঝলমল করছিল চুড়িগুলো, ভাই দুটা অন্য ছেলেদের সাথে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। নীল আশমানে হলুদ, লাল, সবুজ ঘুড়িগুলো কি সুন্দর লাগছিল। এমন সময় গ্রামে ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে জমি কাঁপিয়ে কিছু ট্রাক এসে ঢুকল, প্রথমটা অতটা বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম বোধহয় ভূমিকম্প হচ্ছে। পরে দেখি এই ব্যাপার। ট্রাক থেকে কিছু বন্দুক হাতে লোক এসে নামতে থাকে গ্রামে। আমরা প্রথমটা কিছু বুঝতে পারছিলাম না কি হচ্ছিল, আসলে গ্রামের সহজ সরল মানুষ আমরা, এ সব কি বুঝি? না কোন দিন এ সব চোখে দেখেছি? লোকগুলো এসে আমাদের বলল আজ থেকে স্কুল বন্ধ, কোন পড়াশুনা হবে না। শুধু শরিয়তের নিয়ম এখানে চলবে। ঠিক সময় মতন মসজিদে যেতে হবে, নামাজ পড়তে হবে, না হলে গলা কাটা যাবে। ইয়াকুব চাচার বড় ছেলে ওমর ভাই গর্জে উঠল, ও বলল, নবীজি কোথায় বলে গেছেন নামাজ না পড়লে গলা কাটা পড়বে? কোথায় তিনি বলেছেন পড়াশুনা করা যাবে না, আমাকে দেখাও। যেই না বলা একটা লোক এসে আমাদের সবার সামনে ওমর ভায়ের গলায় কোপ

বসালো, তখনো ওমর ভাই জীবিত, ওঁরা ওর বুক চিড়ে হৃদপিণ্ডটা বের করে নিলো। আমাদের চোখের সামনে ওমর ভাইয়ের হৃদপিণ্ড দিয়ে রক্ত চুয়ে লাল হয়ে গেলো বাগদাদ থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে শামারার মাটি। এত বড় ঘটনা ঘটে গেল কিন্তু কোন কাগজে তা ছাপা হল না, কোন টিভিতে তা দেখান হল না। রাজধানী থেকে সৈন্য আসা তো দূরে থাক একটা পুলিশও এল না। আব্বু আজকাল বড় বেশি চুপচাপ হয়ে গেছেন, সেই উৎফুল্লতা আর কারুর মধ্যে নেই, আহা ইয়াকুব চাচার মুখের দিকে চাওয়া যায়না। এত বড় জোয়ান বেটার শোক চাট্টিখানিক কথা নাকি। আবার এক চাঁদনি রাত এলো, আমাদের গ্রামের সাদা পাথরের মসজিদের মাথায় শ্বেত পাথরের থালার মতন চাঁদ উঠল। আজ ঘরে আমি একা, আম্মি আর ভাই বোনদের নিয়ে আব্বু আমাকে রেখে কোথায় গেছে, কিছু বলে যায়নি। আমি একা, কিন্তু সত্যি বলছি এখনো মনে পড়ে আমার ভয় লাগছিল না, একটুও না।

হঠাৎ দরজা খোলার আওয়াজ হল, আমি এগিয়ে গেলাম বাইরের ঘরে, আব্বুরা এসে গেছে ভেবে। কিন্তু না, এতো আমার আব্বু না, এত অন্য একটা লোক। লোকটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমি বললাম আপনি পাপ করছেন, আমাকে ছেড়ে দিন। লোকটা বলল না কোন পাপ করছি না, এতে আমার জান্নাত হাসিল হবে। লোকটা আল্লাকে স্মরণ করে বিরবির করে কি বলে আমার ওপর অত্যাচার করা শুরু করে দিল। আমি বললাম আল্লা তোমাকে নরকে ঠাঁই দেবে। ও কোন কথা শুনল না। আমার আম্মি আব্বু এলে লোকটা চলে গেল। আমি আম্মিকে বললাম, কেন করলে আমার এই সর্বনাশ? আম্মি পাথরের মতন বলেছিল, না করলে ওরা আমাদের কাউকে বাঁচতে দিত না। এইভাবে দিনের পর দিন ওরা আমার ওপর অত্যাচার চালাতে থাকল। পরে এর নাম জেনেছিলাম সেক্স জিহাদ। অত্যাচার যখন সহ্যের বাইরে চলে গেছিল তখন এক রাতে আব্বু আমাদের নিয়ে আফরিনে নাও ভাসিয়ে অনিশ্চিত কোন এক উদ্দেশ্যে ভেসে পরল। সে ভয়ঙ্কর কষ্ট বলে বোঝাতে পারব না। শুধু পানি আর পানি। পানি দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেলো। খিদে তৃষ্ণা সব মুছে গেছিল শরীর থেকে। আশ্চর্য লাগছিল যখন দেখলাম আব্বু আম্মি কিরকম পাথরের মতন হয়ে গেছিল, কোন কথা নেই তাঁদের মুখে। আমরা ছেলেপুলে অতটা তখন বুঝলাম না বুঝি এই সর্বনাশের পর কারুর মুখ থেকে আর কথা বের হয় না। প্রায় ৭ থেকে ৮ দিন জলে থাকার পর আমরা একটা বড় শহরে এসে পৌঁছালাম, পরে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি সেই শহরের নাম দামাস্কাস। আব্বু আমার ওস্তাদ মানুষ, দু-তিন রকমের ভাষা জানে, আব্বু খবরের কাগজে পড়েছিল সিরিয়াতে ইরাকের ক্যাম্প হয়েছে। একেতাকে জিজ্ঞাসা করে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে পৌঁছালাম। গিয়ে দেখি আমাদের আগে বেশ কয়েকটি ইরাকী পরিবার দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন এখানে। তাঁদের সাথে আমরা থাকতে লাগলাম। আস্তে আস্তে আরও পরিবার আসতে থাকল। আমাদের গ্রামের থেকে বহু পরিবার এখানে চলে এলো। ওঁদের থেকে জেনেছিলাম আমাদের গ্রামের মেয়েদের যৌন দাসী বানিয়ে নিয়ে গেছে ওঁরা, কিছু ছেলে প্রাণের ভয়ে ওঁদের সাথে যোগ দিয়েছে। প্রথম প্রথম দিনগুলো ভালই কাটছিল, একটাই রসুইখানা ছিলো, সেখানে সবার রান্না একসাথে হত। ছেলেরা একসাথে খেলত, মেয়েরা একসাথে গল্প করত। আমরা বহুদিন পর গ্রামের সেই দিনগুলো ফিরে পেলাম। আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম। ভালোই কাটছিল। সারাদিন ভালো কাটলেও রাতে ক্যাম্পে কোন সুরক্ষা ছিল না। খবর আসতে থাকল মেয়ে তুলে নিয়ে যাবার। আমাদেরও ভীমরতি হয়েছিল, আমরা ব্যাপারটা গুরুত্ব দিলাম না। আমার ১০বছরের ছোট বোনটার এক রাতে বেগ এলো। সে আর চাপার ক্ষমতা তার থাকল না, কি আর করবে বলো, বাচ্চা মেয়ে কি আর পারে। আম্মি ওকে নিয়ে গেল বাইরে। সারা রাত কেটে গেল ওঁরা আর ফিরল না। হামিদ ভাই নাকি দেখেছেন কিছু লোক আম্মি আর বোনটাকে মুখ চাপা দিয়ে তুলে নিয়ে গেছে। ক্ষতবিক্ষত আম্মি এক সপ্তাহ পর ফিরে এলো, কিন্তু বোনটার কোন খোঁজ আমরা পেলাম না। আম্মি বলেছিল বোনের মতন ছোট মেয়েদের রাতে বাগান বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় বুড়ো শেখদের রসনা তৃপ্তির জন্য। আব্বু রোজ রাতে খোঁজ নিত কোথায় বোনকে পাওয়া যায়। এইভাবে খোঁজ নিতে নিতে আব্বুও একদিন নিখোঁজ হয়ে গেলো। সে আর ফিরল না। আমরা যখন এখানে এসেছিলাম আমাদের সাথে আরেকজন এসেছিল, আমরা প্রথম প্রথম তার অস্তিত্ব বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলাম যখন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, আম্মি তাঁকে সরাবার চেষ্টা করেনি। কারণ ইসলামে ভ্রুণ হত্যা পাপ। গ্রাম থেকে ফেরার ১০ মাস পর আমি একটা ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দিলাম, আম্মি নাম রাখল নূর। তার রূপের ছটায় আমাদের ক্যাম্পে চাঁদের আলো ফুটল। ছোট বোনটা আর ফিরল না, মেজ বোনটা ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে উঠেছে দেখে আমাদের সত্যি চিন্তার শেষ ছিলো না। অবশেষে এক আরবি শেখের সাথে তাঁকে নিকা করান হল। শেখের বয়েস অনেক বেশি হলেও তার অবস্থা বেশ ভালো ছিলো, আমার

বোন সুখে আছে। শেখরা সিরিয়ার ক্যাম্পে বউ খুঁজতে আসেন কারণ এখানে অন্য দেশের চেয়ে সস্তায় বউ পাওয়া যায়। এরা বাচ্চা সুদ্ধু মহিলাকেও নিকা করেন।

আব্বু, দুই বোন সবাই, একে একে বিদায় নিলো, পড়ে থাকলাম আম্মি, আমি, দুই ভাই আর আমার নূর। আম্মির শরীরটা আজকাল ভালো যায় না, সন্ধ্যা হলে জ্বর আসে, কাশলে রক্ত বের হয়। আম্মি নূরকে আজকাল ধরে না, বলে ওকে দূরে রাখ। মেজ বোনটাকে দিয়ে শেখের কাছ থেকে যেটুকু টাকা পেয়েছিলাম তা প্রায় শেষের পথে। আম্মির চিকিৎসার পেছনে সবথেকে বেশি খরচা হয়ে গেছে। একদিন সন্ধ্যার নামাজের সময় আম্মি দেখলাম ঢলে পড়ে গেলো, সেই যে গেলো আর চোখ খুলল না। আমরা অনাথ হলাম। এখানে সবকটা পরিবারের সবার কিছু না কিছু গল্প আছে। সে কথা বলতে গেলে আমার বলা শেষ হবে না, কিন্তু আপনাদের চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে। নূর বড় হচ্ছে, আজ ৬ মাস পার হয়ে গেছে, এখন বুকের দুধেও ওর পেট ভরে না, আর বুকে দুধ থাকলে তো খাবে তাই না! পেট ভরে না খেলে আর বুকে দুধ হবে কি করে! নূরের কান্না দিন দিন বাড়তে থাকল, ভাইগুলোও বড্ড ছোট, এখনো রোজগারের বয়েস হয়নি তাদের। আমাকেই একদিন কাজের সন্ধানে বের হতে হল রাস্তায়। কোন কাজ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। লেখাপড়া জানলে হয়তো পেতাম, কিন্তু স্কুলটাই শেষ করা হয়নি, কাজ পাই কি করে। কিছু মানুষ শরীরের প্রস্তাব দিলো। তারা বলল, আমি সুন্দরী, আমি শরীর দিলে ওরা আমাকে অনেক টাকা দেবে। আমি প্রথমে রাজি হইনি। সত্যি বলছি হইনি। কিন্তু নূরের কান্না আর ভাইদের অভুক্ত মুখগুলোর কাছে নিজে সতী সেজে থাকাটা সত্যি স্বার্থপরের মতন লাগছিল। সত্যি বলছি আমি বাধ্য হয়ে ওই লাইনে নামলাম। আমাদের দেশের অবস্থা সত্যি ভালো না। খাদ্য নেই, বাসস্থান নেই, নেই কোন সুরক্ষা। এখানে রোজ কোন না কোন মেয়েকে বলি দিতে হচ্ছে। কি আর করা যাবে, একদল বন্দুকধারিদের কাছে যে আমরা বড়ো অসহায়। সারা পৃথিবীর মানুষও সব দেখে নির্বাক। আমরা কি করতে পারি। আমার আব্বু ছিলেন একজন নেক মুসলমান, কিন্তু আজ আমাদের এই পরিণতি। হে আল্লা তুমি কি শুনতে পাচ্ছ, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ আমাদের অবস্থা, না তুমিও তো আজকাল বন্দুকধারীদের হাতে বন্দি।

---

*হিন্দুর পরধর্মশ্রদ্ধা সহিষ্ণুতা প্রবাদপ্রতিম। তারা দশম শতাব্দীতে গুজরাটে, কালিকটে মালাবারে, কুইলনে মুসলমানদের উপাসনার জন্য মসজিদ তৈরী করে দিয়েছে। হিন্দুরা অন্য ধর্মের স্থান ভাঙে না, অন্যের নারীর সম্মান নষ্ট করে না। জোর করে অন্যদের নিজের ধর্মে ধর্মান্তরিত করে না। ইতিহাসে এর অনুকূলে একটি সাক্ষ্য নেই। 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' ভোট সংগ্রহের জন্য বামপন্থীদের একটি স্বরচিত টোপ মাত্র। এত শ্রদ্ধা সহিষ্ণুতার কিন্তু বিনিময় হয়নি। বিজেতা শাসক মুসলিমেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী হিন্দু মন্দির ভেঙেছে। আজও ভেঙে চলেছে। এব্যাপারে হিন্দু বুদ্ধিজীবিদের মৌনতা দর্শনীয়। মন্দির ভাঙলে মুসলমানদের দুঃখিত অনুতপ্ত হতে দেখা যায়নি কখনও। তাহলে সম্প্রীতি আসবে কোথা থেকে? মুসলমানেরা নিরন্তর আক্রমণ করে যাবে, নিজেদের গোঁড়ামিতে থাকবে অনড়, আর হিন্দুরা শুধুই মিত্রতার হাত বাড়িয়ে দেবে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে মিছিল করবে, সেমিনার করবে, এটা বেশীদিন চলে না। —**শিবপ্রসাদ রায়***

সবুজ আলো

বছর দুয়েক আগের কথা।

ব্যাচেলর লাইফ, ছোটো খাটো একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরী, মা বাবা আর ছোটো বোনকে নিয়ে ছোটো সুখের সংসার।

বাবা একটা জুটমিলে রিটায়ার করে প্রবিডেন্ট ফান্ডের সামান্য টাকায় দু কামরার একটা বাড়িও করেছেন, সামান্য কিছু দেনাও হয়েছে।

ভবিষ্যৎ-এর স্বপ্ন দেখছি আমার গার্লফ্রেন্ড প্রিয়াকে নিয়ে। আমাকে খুবই ভালবাসে প্রিয়া। আমরা ঠিক করেছি, বাবার দেনাটা শোধ করেই বিয়েটা সেরে নেবো। রাতে আমাদের কথাও হয় ফেসবুকে। কম খরচে অনেক কথা, মন চাইলে সারারাত। আমার ফ্রেন্ডলিস্টে প্রায় কম বেশি করে একশো সদস্য। সকলের সাথে না হলেও অনেকেরই সাথে নিয়মিত কথা হয়। এমনি অল্প কথা বলা একজন ছিলো,বীথি শর্মা। অবাঙালী হলেও পরিস্কার বাংলা বলতে পারতো। আমি পাঁচটা এসএমএস করলে একটার উত্তর দিত। কখনো শুধুই লাইক দিয়ে ছেড়ে দিত।

প্রোফাইলের ছবিটাও খুব সুন্দর, এককথায় সুন্দরী বলা চলে, বড় বড় চোখ মুখে মৃদু হাসি সত্যিই।

কোম্পানিতে লেবারদের দাবিদাওয়া আর ইউনিয়ান বাজিতে বন্ধই হয়ে গেল কোম্পানি। একেবারেই কর্মহীন হয়ে গেলাম। ভাবলাম একটা কাজ ঠিকই জুটিয়ে নেব। এমন ভাবনা আমার মিথ্যে হয়ে গেল। এইভাবে কয়েক মাস কেটে গেল, একে একে মায়ের গয়না দোকানে বাঁধা পড়লো।

সংসার বাঁচাতে রাজমিস্ত্রির জোগারের কাজের জন্য কথা বললাম, সেখানেও নিলো না, কারণ কাজের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। সাফ জানিয়ে দিল, তোমার দ্বারা এ কাজ হবেনা।

অবস্থা বুঝে মুদিওয়ালাও ধার বন্ধ করে দিল।

ছোটো বোনটা ক্লাস টেনে পড়ে। সেও দেখি খিদে নেই বলে, কিছু না খেয়েই স্কুলে চলে গেল।

মা বাবার মুখের দিকে তাকাতেই পারছিনা।

গত রাতে প্রিয়া বলে দিল, অন্য জায়গায় নাকি বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। আর যেন কখনোই ডিস্টার্ব না করি। যাকে এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সবার আগে সেই পালিয়ে গেল।

বন্ধুরাও প্রায় সবাই বেকার। কিন্তু ওদের কেউ না কেউ আছে সংসার চালানোর মত। তবুও ওরা অনেক সাহায্য করেছে। অভাব যে এত ভয়ঙ্কর তা আগে জানা ছিলনা।

মায়ের মুখঝামটা, বাবার শুকনো মুখের কটাক্ষ দৃষ্টি, যে বোনটার সারাটা দিন টুকটাক করে মুখ চলতো সে আজ খালি পেটে বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে।

আর পারছি না, এভাবে বাঁচার কোন মানেই হয়না। আজেবাজে উল্টোপাল্টা চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। অনেক রাতে বাড়ি ফিরছিলাম। বন্ধুর খাওয়ানো চা বিস্কুট অনেক আগেই হজম হয়ে গেছে। এবার বিষ খেতে ইচ্ছা করছে। হ্যাঁ, এটাই একমাত্র পথ, অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির উপায় এটাই। হ্যাঁ সুইসাইড, মাথার মধ্যে ফিক্সড হয়ে গেল। এছাড়া আর কিছুই মাথায় আসছেনা।

পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে ফেসবুক খুললাম। ফ্রেন্ড লিস্টের বন্ধুরা যারা অন লাইন ছিলো, তাদের মধ্যে প্রিয়া ছিলো এক নাম্বারে, তাই ওকেই প্রথমে লিখলাম, গুড বাই প্রিয়া, চললাম্।

হুঁ হুঁ, নো রিপ্লাই, হয়তো ব্যস্ত আছে অন্য কারোর সাথে।

তারপর পরপর প্রত্যেককেই একই কথা লিখে ফরোয়ার্ড করলাম, 'গুড বাই বন্ধু চললাম্'। তার মধ্যে অনেকে অনেক রকম রিপ্লাই করলো। কেউ- ভালো থাকিস। কেউ- কোথাও বেড়াতে যাচ্ছো নাকি? কেউ- কোন কাজের জন্যে দেশ ছাড়ছো নাকি?

কিন্তু একমাত্র বীথিই ব্যাপারটা ঠিক আন্দাজ করেছিলো। যে কিনা অনেক কথা বলার পর তবে একটা রিপ্লাই দেয়। সে পরস্পর প্রশ্নবাণে আমাকে ঘায়েল করে ফেলল।

একের পর এক প্রশ্ন- এই তুমি কোথায় যাচ্ছো?

তোমার গুড বাই বলার ধরণটা একটু অন্য রকম! জীবনে থেকে পালিয়ে যাচ্ছ না তো?

কি হয়েছে তোমার?

প্রেমিকা ধোঁকা দিয়েছে?

সুইসাইড করার কথা ভাবছ না তো?

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আগে যেটুকু কথা হয়েছে, হাই, হ্যালো, কেমন আছো, ভালো আছি, ব্যাস এইটুকুই। এর পরের কথার কখনই উত্তর পাইনি, আর আজ! সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে হুঁ লিখে সেন্ড করে ফেলেছি -

আবার শুরু হয়ে গেল-

এ মা তুমি কি বোকা।

এই সামান্য কারণে কেউ সুইসাইড করে নাকি?

বছরের ঋতু পরিবর্তনের মতই প্রেমিক প্রেমিকারা আসে আর যায়, ছাড়ো ওসব কথা, তুমি চাইলে আমাকে ভালোবাসতে পারো। আমি দেখতেও খুব খারাপ নই। কথা দিচ্ছি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বেইমানি করবনা।

আমি একটু ঝেড়ে কাশলাম। সংক্ষেপে আমার সব সমস্যাগুলো বললাম।

সব শুনে ফোনের ওপার থেকে বীথি যে কথা গুলো বলল,

তুমি একজন বীর যোদ্ধা, তোমার লড়াইয়ের উপরে আরো তিন তিনটি প্রাণীর বাঁচা মরা নির্ভর করছে। তুমি নিশ্চিত জানবে, তোমার জীবনে যখন ঘন অন্ধকার, ঠিক তার পরেই ভগবান তোমার জন্য একটি সুন্দর সকাল রচনা করে রেখেছেন।

আরে বোকা, ভগবান এভাবেই পরীক্ষা নেন। তোমাকে যে উত্তীর্ণ হতেই হবে।

কথা শেষ হতেই বীথির একটা সেলফি ভেসে উঠলো মোবাইলের স্ক্রিনে। আমাকে ছুঁয়ে কথা দাও, এ লড়াইটা তুমি লড়বে। আমার ভালবাসার দিব্যি, এ লড়াই তোমাকে জিততেই হবে।

বিছানার উপর মোবাইলটা রাখা, পরপর লেখাগুলো ফুটে উঠছে, মনে মনে লেখাগুলো আউরে যাচ্ছি। কি উত্তর দেব কিছু ভেবে পাচ্ছিনা। হাতের আঙুলগুলো যেন অসাড় হয়ে গেছে।

আবার- কি হলো! কিছু তো বল।

অনেক কষ্টে টাইপ করলাম, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বীথি- হ্যাঁ নিশ্চয়, বল কবে কোথায় দেখা করতে চাও?

বললাম- কাল বিকেল পাঁচটায় বাবুঘাটে নদীর ধারে পার্কে।

বীথি- তুমি ঠিক আসবে তো? তোমার নম্বরটা দাও, যদি তোমার আসতে দেরি হয়। আমি কিন্তু অপেক্ষা করবো।

বললাম- হ্যাঁ ঠিক আসবো, সঙ্গে ফোন নম্বরটা টাইপ করে দিলাম।

বীথি- তাহলে এখন ভালোছেলের মতো ফোন রেখে ঘুমিয়ে পড়ো, কাল তাহলে আমাদের দেখা হচ্ছে।

Goog night Sweet dreams..... বলে অফলাইন হয়ে গেল। আমিও ফোন বন্ধ করলাম।

ভাবতে লাগলাম, কে এই বীথি?

তা সে যেই হোক, ওর কয়েকটা কথায় জীবনের সিদ্ধান্তটাই পাল্টে গেল।

থেমে যাওয়া গাড়ি যেন নতুন করে আবার গতি ফিরে পেল।

আর প্রিয়া, সেও তো একটা মেয়ে! কত তফাৎ দুজনের মধ্যে। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে দরজা ধাক্কায় ঘুমটা ভেঙে গেল, খুলে দেখি আমার বন্ধু সুব্রত। বলল আমার দাদা আমার জন্য একটা কাজ দেখেছে, কিন্তু আমি চাই কাজটা তুই কর, এই মুহূর্তে কাজটা তোর খুবই দরকার।

কলকাতায় এক চায়ের গোডাউনে লেবার দেখাশুনার কাজ, মাইনে সাত হাজার দেবে, এক তারিখে জয়েন্ট, পাঁচ দিন বাকি।

বললাম- কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো!

সুব্রত- ওসব পরে হবে, আমি দাদাকে ব্যবস্থা করতে বলছি। চলে গেল সুব্রত।

বীথির কথা এতো তাড়াতাড়ি ফলে যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ বিকেলে বীথির সাথে দেখা করতেই হবে।

যথারীতি পাঁচটার আগেই যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম, চোখ পড়ে গেল বীথি আমারো আগে পৌঁছে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তাকিয়ে আছে আমারই দিকে। যেন প্রয়োজনটা ওরই।

একটা হালকা হাসি দিয়ে বলল- এই তো, ঠিক সময়ের মধ্যেই এসে গেছে আমার যোদ্ধা, ঠিক এইভাবেই সময়ের মূল্য দিও।

ওর কথায় বুকটা ভরে গেল। ওর চোখের দৃষ্টি এতটাই তীক্ষ্ণ যে, আমার চোখের দরজা দিয়ে ঢুকে মনের ভেতরটাও দেখতে পাচ্ছে।

দুজনেই একটা বেঞ্চে গিয়ে বসালম নদীর দিকে মুখ করে। সূর্য ডুবছে, লাল আবিরের রঙে আকাশটা রাঙিয়ে দিয়েছে। আগে কখনো এভাবে আকাশকে দেখিনি।

হঠাৎই বীথি বলে উঠলো, ও যোদ্ধা বলো কি যেন বলবে বলে ডেকেছিলে!

বললাম- আমার মনে হয়, যেটা বলতে চাই তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা, তুমি আগে থেকেই সব জেনে গেছ।

বীথি- হ্যাঁ জানি,

বললাম- কি জানো?

বীথি- এই যে সামনেই ফুচকাওয়ালা, ঝালমুড়িওয়ালারা দোকান দিয়েছে। তোমার খুব ইচ্ছে করছে আমাকে মন ভরে খাওয়াতে। কিন্তু তোমার পকেট একেবারে গড়ের মাঠ, খাওয়াতে পারছ না, তাই মনে মনে কষ্ট পাচ্ছ।

আমি এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম, আর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি- আর ভাবছি, আরে সত্যি সত্যিই তো আমি এটাই ভাবছিলাম।

কৌতূহল আর চাপতে পারলাম না, বলেই ফেললাম, এই তুমি কে বলতো?

খুব সহজ ভাবেই উত্তর দিল- তোমার প্রেমিকা।

হাতটা ধরে এক ঝটকায় আবার পাশে বসিয়ে দিল।

আর বলল- যা বলি মন দিয়ে শোনো,

প্রশ্ন করলো- জানো আমাদের প্রেমের মেয়াদ কতদিনের?

আমি- না জানিনা।

বীথি- মাত্র এক দিনের।

তুমি কি জানো আমার প্রেমিকের সংখ্যা কত?

আমি- না জানি না।

বীথি- তোমাকে নিয়ে ২১০ জন।

তুমি কি জানো, কেন আমি এক দিনের বেশি সম্পর্ক রাখিনা?

আমি- না।

বীথি- কারণ, একটা যোদ্ধা তৈরী করতে আমার কাছে এক দিনই যথেষ্ট। এবার বল আমার বীর যোদ্ধা, তুমি কি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত?

কথাগুলো শুনে আমার দম আটকে গিয়েছিলো, যেন অন্য কোন জগৎ-এ বিচরণ করছিলাম। আমার কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, শুনছো আমার কথা? তুমি কি প্রস্তুত?

আমি- হ্যাঁ আমি অনেক আগেই প্রস্তুত।

দুহাতে আমার গাল দুটো ধরে বলল, চোখ বন্ধ করো। করলাম- ঠোঁটে চুম্বনের পরশ পেলাম।

সারা শরীর মনে এক ঐশ্বরিক অনুভুতির স্বাদ পেলাম, সেটা ভাষায় বর্ণনা করতে পারবনা।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বীথি আমার দিকে দুহাত বাড়িয়ে বলল, তুমি চাইলে আমাকে আলিঙ্গন করতে পারো। আমি আশেপাশে দেখলাম, অনেক মানুষের ভিড়।

বীথি- আমি কাউকে তোয়াক্কা করিনা।

আমি মাথা নেড়ে না বলে দিলাম।

এবার আরো কাছে ঘেঁসে বসলো, শরীরের আধখানা অংশ আমাকে ছুঁয়ে আছে। শান্ত গলায়- আবার প্রশ্ন- জানো যোদ্ধা আমার আয়ু আর কতদিন?

এবার আমি ভাল করে মুখের দেখি তাকালাম।

নিয়ন আলোয় চোখের কোনে জল চিকচিক করছে, আর মাত্র ১১৯ দিন, আমি ক্যান্সারে আক্রান্ত। যোদ্ধা আমি মরতে চাইনা, আমি বাঁচতে চাই।

আমার দিন একটা একটা করে ফুরিয়ে আসছে।

আমার ভেতরটা আমার অজান্তেই কেঁদে উঠল, চোখের জলকে আর আটকে রাখতে পারলাম না।

বীথি- কি হলো যোদ্ধা? তোমার চোখে জল? তুমি না আমার বীর যোদ্ধা, আর বীরের চোখে জল শোভা পায় না।

আমি বললাম- নিজের জন্য নয়, তোমার কথা ভেবেই কাঁদছি। তোমার যে মহৎ উদ্দেশ্য, তার কথা ভেবে কাঁদছি, এখন আমি বুঝতে পারছি তোমার এই একদিনের ভালবাসায় একটা মানুষ একশো বছর পর্যন্ত বাঁচার শক্তি ফিরে পাবে। তোমার অবর্তমানে যারা তোমার এই ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবে, তাদের কথা ভেবে কাঁদছি।

এবার বীথিও কেঁদে ফেলল।

বলল- বাহঃ, আমার যোদ্ধা এবার পুরোপুরি তৈরী। যোদ্ধা কয়েকটা জরুরী কথা- আমি আর কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা করবো না, প্রয়োজনে আমি তোমাকে ডেকে নেব।

ফেসবুকে আমার উপস্থিতি দেখেও কখনো এসএমএস করবেনা।

আমার নামের পাশে ঐ সবুজ বাতিটা যতদিন দেখতে পাবে, জানবে ততদিন আমিও আছি। তোমার সাথেই আছি।

কখনো যদি আমার জন্য মনটা কেঁদে ওঠে, এই সময়, এইখানে, এই বেঞ্চে এসে বসো। আর আবিরে রাঙানো ডুবে যাওয়া ঐ সূর্যটাকে দেখো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, যোদ্ধা এবার আমাকে উঠতে হবে, আমার অনেক কাজ আর হাতে সময় খুবই কম। তুমি অনুমতি দাও।

আমি বললাম- তোমায় বেঁধে রাখার কোন ক্ষমতাই আমার নেই। তুমি যাও আবার নতুন কোন যোদ্ধার খোঁজে।

আমার কাঁধটা আলতোভাবে ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

বীথি হারিয়ে গেল মানুষের ভিড়ে।

আমি বীথিতে মোহিত হয়ে গেলাম, আমি যেন আর আমার মধ্যে নেই, সম্পূর্ণ এক অন্য মানুষ।

পরেরদিন সকালে একটা মেসেজ পেলাম। কলকাতার এক অনামী পাখা কারখানায় প্রোডাকশন ম্যানেজারের পদের চাকরীর জন্য।

আর চাকরীটা পেতে কোন অসুবিধা হয়নি।

ছোট্ট কারখানা, মালিকের অবর্তমানে আমাকেই সবকিছু দেখতে হয়। জীবনটা আগের মতই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

রোজ রাতে ফেসবুক খুলে বীথির উপস্থিতি লক্ষ্য করি, জ্বলজ্বল করছে সবুজ আলোটা, বীথি এখনো অনলাইন আছে। অনেক ম্যাসেজ আসে, কোন মেসেজই আর পড়তে ইচ্ছা করে না। অনেক মেসেজের ভিড়ে প্রিয়ারও মেসেজ আসে। আর দেখিনা, শুধু সবুজ আলো ছাড়া।

জানি এটাও একদিন হঠাৎই নিভে যাবে, আর জ্বলবেনা।

এমনি একদিন তাকিয়ে আছি সবুজ আলোটার দিকে, হঠাৎই মেসেজ এলো বীথি শর্মার প্রোফাইল থেকে। বুকটা ছ্যাঁত করে উঠলো, তাতে লেখা-

যোদ্ধা , যদি শেষ দেখাটা দেখতে চাও তাড়াতাড়ি চলে এসো, সময় খুবই কম।

নীচে পাটনার একটা ঠিকানা দেওয়া।

তখন অনেক রাত- ভোর হতেই বেরিয়ে পড়লাম একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে।

ঠিকানায় পৌঁছতে কোন অসুবিধা হয়নি।

কলকাতায় বড়বাজারে মামার কাছে থাকতো, এটা নিজের বাড়ি। অনেক পুরানো আমলের বাড়ি, চারিদিক ঘেরা, মাঝে বিশাল বড় দালান, বাইরে ভিতরে প্রচুর মানুষের ভিড়, সবার চোখেই জল।

কোথায় বীথি, মনটা উৎকণ্ঠায় ছটফট করছে।

ভিড় ঠেলে ভিতরের দিকে যাচ্ছি, হঠাৎ কেউ হাতটা ধরে ফেলল, দেখি জল ভরা চোখে আমার মালিক।

ভিড় কাটিয়ে আমাকে নিয়ে গেল বীথির কাছে।

দালানের একপ্রান্তে পালঙ্কের উপরে রানীর মত শুয়ে আছে বীথি। বড় বড় চোখের কোণে কালি, শুকনো মুখ, বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশেই গেছে।

কিন্তু ঠোঁটের কোণে সেই অম্লান হাসি এখনো বর্তমান।

বীথি বলল- আমার পাশে বস।

আমি বসলাম। আমার হাতটা নিয়ে একটা চুমু দিয়ে বলল, জানো যোদ্ধা আমি তোমায় রোজ দেখতাম তুমি তাকিয়ে আছো আমার প্রোফাইলের ঐ সবুজ বাতিটার দিকে, আজ থেকে ওটা আর জ্বলবেনা।

আমি কথা দিয়েছিলাম বেইমানী করবোনা, দেখো-

আমার শেষ দিনেও তোমাকে আমার ভালবাসা দিতে পেরেছি, আমি আবার আসবো তোমাদের মাঝে, আবার আমি যোদ্ধারূপে তোমাদের পাশে পাবো।

আর এই যে এখানে এতো মানুষ দেখছো, এদের মধ্যে অনেকেই তোমার মত বীর যোদ্ধা।

আজ আমার একটুও কান্না পেলনা, কারণ-

বীথি কথা দিয়েছে আবার আসবে।

বীথি বলল এবার তুমি যাও, আর এক যোদ্ধা এসেছে শেষ দেখা করতে।

আমি আর পেছন ফিরে তাকাইনি, আমি চলে যাওয়া সইতে পারি না।

এখনো আমি প্রতি রাতে একবার করে দেখি।

বীথির প্রোফাইলটা -

যদি একবার জ্বলে ওঠে সবুজ আলোটা!

শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ—

স্টার প্লাইউড সেন্টার

সমস্ত নামী-দামী কোম্পানীর প্লাইউড ও
সানমাইকা খুচরো ও
পাইকারী বিক্রির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রোঃ- সৌমেন দাস

মোবাইল-৯৮৩০৮৩৯৮৩২/৯৮৩০৪৫৬৮৭৯

ভ্যান রিক্সা

ডাঃ অরুণ কুমার গিরি

পূর্ব মেদিনীপুরের পেটুয়াঘাটের ভেসল প্যাসেঞ্জার নিয়ে যখন গঙ্গাসাগরের মায়া গোয়ালিনী ঘাটে পৌঁছলো তখন বেলা প্রায় বারোটা। প্রচন্ড রোদ। ভ্যান রিকস্াগুলো পঞ্চায়েতের তৈরী ইঁটের রাস্তায় সারি সারি দাঁড়িয়ে। রিক্সাগুলো প্যাসেঞ্জার ভর্তি করে গন্তব্য স্থলে চলতে শুরু করল। দারিয়াপুর থেকে আসা বটু মাইতি, গুনধর জানা ও নগেন ঘোড়ই একটা রিক্সায় উঠলো- ছয়েব ঘেরী যাবে।

রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার খালেক শেখ ঝিল ঘেরীর কাছে একটা বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে অনেক্ষণ ধরে ভ্যান রিক্সার জন্য অপেক্ষা করছিল, চেমাগুড়ি বাজার যাওয়ার অভিপ্রায়ে। বটু মাইতিদের মোটামুটি ফাঁকা রিক্সা দেখে

খালেক শেখ ওটাকে দাঁড় করাল। তাকে দেখে, ''এখানে বসুন'' বলে বটু রিক্সার সামনের ডানদিকের জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে রিক্সার পেছনে গিয়ে বসলো।

খালেক শেখ , বর্তমানে এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তি। তাকে চেনেনা এমন লোক এ তল্লাটে খুব কম জনই আছে। সে এখন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। রিক্সা চলতে শুরু করেছে। জানা শোনা লোকের সাথে রিক্সায় চুপচাপ বসে থাকা যায় না। তাই বটু বললো- কেমন আছেন খালেকদা? উত্তরে খালেক জানালো- এই একরকম চলে যাচ্ছে। বটুর আবার প্রশ্ন- কেন? আপনার তো এখন বৃহস্পতি তুঙ্গে। আপনি পঞ্চায়েত মেম্বার। আপনার কত নাম ডাক হয়েছে। এলাকার লোকজনের নানান সমস্যা মেটাচ্ছেন। সত্যি খালেকদা, আপনি ভীষণ কাজের লোক।

খালেককে এইসব প্রশংসার কথা মুখে বললেও মনে মনে খিস্তি আউড়ে বটু বলতে চাইলো- শালা খালেক, আগে রিক্সা টানতো। তারপর বাম আমলে রিক্সা ইউনিয়নের সেক্রেটারী হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করলো। তার দৌরাত্ম্যে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। তার লোলুপ দৃষ্টি শুধু যুবতী মেয়েদের উপর- সে হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক, কোন বাদ বিচার নেই। কত মেয়ে, বউ, বিধবার যে সর্বনাশ করেছে তার হিসাব মেলা ভার। বাম আমল শেষ হয়ে তৃণমূল ক্ষমতায় এলো। খালেক শেখ এখন ভোল বদলে তৃণমূলী হয়েছে। সংসারে তার চারটি তরতাজা বিবি। ছেলে মেয়েদের সংখ্যা বর্তমানে সতের। লোকে বলাবলি করছে এই সংখ্যা দুই-আড়াই ডজন ছাড়িয়ে যেতে পারে।

কথায় কথায় রিক্সা ততক্ষণে দেবেন্দ্র বিদ্যাপীঠ স্কুলের কাছে এলে খালেক ষোল-সতের বছরের রিক্সাওয়ালাকে বললো- একটু দাঁড়াতো বাপ্। একটা কাজ সেরে আসছি- দু-পাঁচ মিনিট সময় লাগবে। সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে বটুর সাথী নগেন বললো, আমাদের বিশেষ তাড়া আছে। খালেকদা, আপনি বরং রিক্সাটা ছেড়ে দিন। খালেক অসন্তুষ্ট হয়ে ''আচ্ছা ঠিক আছে, আমি নেমে যাচ্ছি'' বলে রিক্সাওয়ালাকে দশটা টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললো- ''তোর ভাড়া নিয়ে নে।'' ভাড়া না নিয়ে রিক্সাওয়ালা বললো- 'বাপজান, আমি মকবুল, তোমার প্রথম পক্ষের ছেলে।'

-অ্যাঁ বলিস কিরে? তুই কি করে আমার ছেলে হলি?

মকবুল- হ্যাঁ বাপজান। আমি তখন খুব ছোট ছিলাম। বড় হয়ে মার কাছ থেকে জেনেছি তুমি মদ খেয়ে মাকে খুব মারধোর করতে। পাড়ার লোকজনের কাছে মা নালিশ জানালে তুমি মাকে তালাক তালাক তালাক বলে মারতে মারতে ঘর থেকে বের করে দিলে। পরে ওই ঘর বেচে দিয়ে কমলপুলে আবার নতুন ডেরা বানালে। বাপজান, তোমার কাছ থেকে রিক্সার ভাড়া নিতে পারবো না। তা ছাড়া এটা তো তোমার আগেকার সেই রিক্সা। সালিসিতে মোড়ল মশায় তোমার শাস্তি হিসাবে কেড়ে রেখে দিয়েছিলেন। সেই রিক্সা আমি এখন চালাচ্ছি।

খালেক শেখ বেগতিক দেখে কথা না বাড়িয়ে রিক্সা ছেড়ে দিয়ে গুটি গুটি পায়ে হাঁটতে শুরু করলো।

ডুয়েল

অম্বিকা গুহরায়

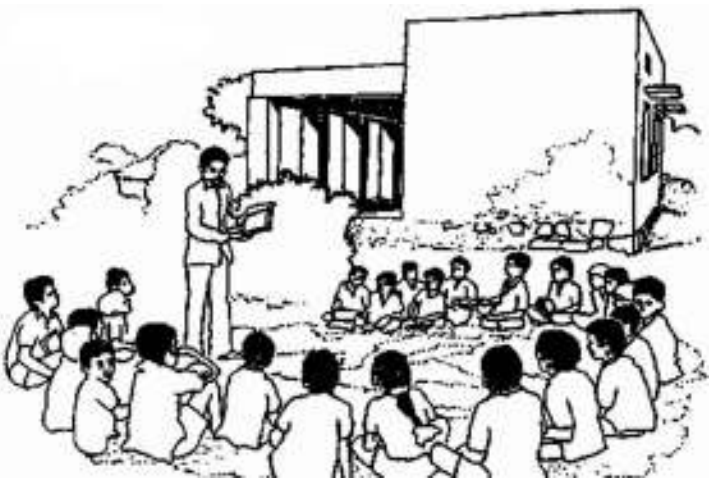

খবরটা জানাজানি হতেই স্কুলের মধ্যে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ কান্ড বেঁধে গেল। শুক্রবার। ভরা সাতটা পিরিয়ড। কিন্তু তৃতীয় পিরিয়ডের পরই নোটিশ এল, আজ চতুর্থ পিরিয়ড অর্থাৎ টিফিনের পরই স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। ছুটির পর প্রত্যেক ছাত্রকে স্কুলের উঠোনে আসতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এমন কি শনিবার দিনও স্কুল ছুটি থাকবে।

খুশীর খবর নিশ্চয়ই। কিন্তু খবরটা কী? চাপা একটা উত্তেজনা বইছে দ্বাদশ শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে।

ছুটির পর সব ছাত্র এসে হাজির হয়েছে উঠোনে। শিক্ষকরাই তাদের শ্রেণি ধরে লাইন করে দাঁড় করাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর হেডস্যার এসে দাঁড়ালেন উঁচু লনটায়। ছাত্রদের একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, আমার প্রিয় ছাত্ররা, সামনের মাস থেকে আমরা সরকারী অনুদান পেতে চলেছি। এতে আর্থিক দিক দিয়ে আমরা লাভবান হব। স্কুলের লাইব্রেরী নতুন করে ঢেলে সাজানো যাবে, নতুন কম্পিউটার রুম হবে, ল্যাবরেটারি আরও আধুনিক মানের হবে। সর্বোপরি স্কুলের শিক্ষকদের মাইনে এবার থেকে সরকার দেবে। সব দিক দিয়েই এটা খুশীর খবর।

ছাত্রদের মধ্যে একটা কোলাহল পড়ে গেল। হেড মাস্টার হাত তুলে তাদের থামালেন। বললেন, আরও একটা খুশীর খবর আছে। এবার থেকে স্কুলের একজন ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার জন্য স্কলারশিপ্ দেওয়া হবে। আর তা দেওয়া হবে উচ্চমাধ্যমিকে যে নব্বই শতাংশের বেশি নম্বর পাবে তাকে।

আচ্ছা স্যার, যদি দু'জন নব্বই শতাংশের বেশি নম্বর পায়। কথাটা বলে ওঠে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র অপূর্ব।

দুজনকেই দিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু আমাদের অত সামর্থ্য নেই। এই দুইজনের মধ্যে যে বেশি পাবে তাকেই স্কলারশিপ্ দেওয়া হবে।

হেডস্যার উঠে যেতেই একটা চাপা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। বিশেষ করে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে। প্রত্যেকেই খুশী। বিপুল, প্রশান্তর মতো সাধারণ ছেলেরাও উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। জানে তারা কোনদিনই স্কলারশিপ্ পাবেনা। তবু, হেডস্যারের কথাটা যেন তাদের সামনেও একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। ভালো রেজাল্ট করার চ্যালেঞ্জ।

বাঁকুড়া জেলার ছাতনা হাইস্কুলের নাম কারুর শোনার কথা নয়। একে তো অখ্যাত অজ্ঞাত জায়গা, তার উপর বোর্ড পরীক্ষায় স্কুলের রেজাল্ট এমন কিছু হয়নি যে মনে রাখার মতো। একসময় এলাকার প্রভাবশালী লক্ষীনারায়ণ জোয়াদ্দার স্কুলটি তৈরি করেন। পরবর্তীকালে তাদের প্রভাব গেছে। স্কুলটিও দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সংকটে ভুগছিল, এলাকার মানুষরাই অনুদান দিয়ে স্কুলটাকে চালাচ্ছিল। তবে মানতে হবে শিক্ষকদের ধৈর্য্যকে। অল্প মাইনা। তাও প্রতি মাসে ঠিক সময়ে জোটে না। তবু ছাত্র পড়ানোয় কোথাও খামতি তাঁরা রাখেন নি।

অঞ্চলে এই একটাই হাইস্কুল। যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ছেলেগুলোকে কোথায় পাঠাবে এই ছিল অভিভাবকদের চিন্তা। আজ সকলের স্বস্তি। সরকারি সাহায্য পাওয়ার আনন্দটা শিক্ষকদের মতো ছাতনার সমস্ত মানুষকে ছুঁয়ে গেছে। স্কুলটা আর উঠে যাবার ভয় নেই বলে।

কিন্তু স্কলারশিপ্ পাওয়ার ব্যাপারটা শুধুমাত্র দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে একটা চাপা টেনশন এনে দিয়েছে। স্কুলের সব শিক্ষকরাই বলে এবারের উচ্চমাধ্যমিকের ব্যাচটা সবচেয়ে ভালো। অপূর্ব, অতনু, রমেন, বিশ্বনাথ, সুজয়, দিবাকর এরা সকলেই ব্রিলিয়ান্ট। প্রত্যেকেই আশি শতাংশের বেশি নাম্বার পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। বিশেষ করে অপূর্ব আর অতনু তো ক্লাসের রত্ন।

ওদের দুজনের মধ্যে কেউ স্কলারশিপ্টা পাবে। আলোচনা হয় ছাত্রদের মধ্যে। তবে শিক্ষকরা সকলেই উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। চাইলে রমেন, বিশ্বনাথ, দিবাকররা ওদের ছাপিয়ে যেতে পারে।

অঙ্কের স্যার সতীশবাবু বলেন, এটাকে তোমরা একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা বলে ধরে নাও। প্রত্যেকে লক্ষ্যের দিকে ছোট। লক্ষ্য বড় হলে তার ফলও বড় হয়। তোমরা প্রমাণ করে দাও সরকার আমাদের স্কুলকে অনুদান দিয়ে ভুল করেনি।

আড়াই মাস পরে টেস্ট। শিক্ষকরাও উঠে পড়ে লেগেছেন। হেডমাস্টার শনিবারও পুরো স্কুল করার নির্দেশ দিয়েছেন দ্বাদশ শ্রেণিকে।

সকলেই খুব সিরিয়াস। শুধু অপূর্ব আগের মতোই রয়ে গেছে। গল্প করা, খেলাধূলা, সকলের পিছনে লাগার বিরাম নেই। অথচ এগারো থেকে ফার্স্ট হয়েই সে উঠেছে।

রমেন বলে, তোর চিন্তা নেই। ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, ম্যাথে তো কেউ তোকে মারতে পারবে না।

তোরা তো সব রামগড়ুরের ছানা হয়ে বসে আছিস। প্রতিবাদ করে ওঠে অপূর্ব। কেউ যেন তোদের হাসতে মানা করে দিয়েছে। তোদের দেখাদেখি প্রশান্ত, বিপুল, জয়ন্তরাও বইয়ের মধ্যে ডুব দিয়ে বসে আছে।

আমাকে আবার এর মধ্যে টানা কেন? যতই পড়ি টেনেটুনে বড়জোড় ফার্স্ট ডিভিশন। বিপুল বলে।

কিন্তু তুই তো স্কুলের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন। এটা তোর ক্রেডিট। দেখিস, আমাকে যেন টিম থেকে বাদ দিস না। তাহলে রেজাল্টও গোল্লায় যাবে।

বিপুল হাসে। বলে, অপূর্ব তোকে ছাড়া ফুটবল টিমের কথা ভাবাই যায় না।

দিবাকর প্রশ্নটা করে অপূর্বকে, আচ্ছা তোর অঙ্কের তেইশ চ্যাপ্টার হয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

আমার বড্ড শক্ত লাগছে। একটু হেল্প করবি।

অন্য সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল অপূর্ব।

প্রত্যেকের যেন একই কথা। এমন কি অতনু পর্যন্ত।

করতে পারি। যদি তোরা এখন বই বন্ধ করিস। আচ্ছা, টিফিনেও কি তোরা মুখ গুঁজে পড়তে থাকবি? হেডস্যার দেখছি আমাদের ঘোর বিপদে ফেলে দিয়েছে।

এরপর আর কথা চলে না। সকলে বই বন্ধ করে আড্ডায় মেতে ওঠে।

এই তো চাই। 'আমরা নুতন যৌবনেরই দূত' বলে গান ধরে অপূর্ব। সকলে গলা মেলায়।

টেস্টের রেজাল্ট বের হতে দেখা গেল অপূর্ব সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। একমাত্র ওরই নম্বর নব্বইয়ের ঘরে। অতুন সাতাশি পেয়েছে। রমেন, বিশ্বনাথরা কেউ আশি, কেউ আশি ছুঁই ছুঁই।

এতো জানাই ছিল। সুজয় বলে। অপূর্বর স্কলারশিপ্ পাওয়াটা বাঁধা! অঙ্কে একশোয় একশো পেয়েছে অপূর্ব। তাই সকলে মিলে ধরে তাকে।

অ্যাই অপূর্ব, কি খাওয়াবি বল? প্রশান্তটা একটু পেটুক।

কি খেতে চাস বল তোরা।

ভোলাদার দোকানের পাঁঠার ঘুঘনি আর রুটি। অবশ্য আমরাও কিছু কিছু করে দেব। আফটার অল তুই আমাদের গর্ব।

বিপুলের কথায় সকলেই সায় দেয়।

তাহলে আজকেই হয়ে যাক। প্রশান্তর যেন আর তর সইছে না।

শুধু অতনু কেমন একটু মনমরা। সকলের কথায় সায় দিলেও ওর মুখ দেখেই অপূর্ব বুঝতে পারে। কিন্তু ওরা তো সকলেই বন্ধু। ওর সাফল্যে অতনু কি জেলাস! হতে পারে, ওর জন্যই অতনু কখনও ফাস্ট হতে পারেনি ক্লাসে। এমন কি কাজ আছে বলে ছুটির পর চলে গেল। এত আনন্দের খাওয়াতেও অংশ নিল না।

সামনে ফাইন্যাল। সবাই খুব মনোযোগী পড়াশুনায়। হেডস্যার যেন অলক্ষ্যে সবার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অপূর্ব কিংবা অতনু। কে পাবে স্কলারশিপ্টা। মাত্র সতেরো নম্বরের ফারাক। অতনু কি শেষ লড়াইতে অপূর্বকে মেরে দিতে পারবে, নাকি অপূর্ব ধরে রাখতে পারবে নিজের জায়গা! একটা ডুয়েল যেন শুরু হয়ে গেছে। ছাত্রদের মতো শিক্ষকদের মধ্যেও চাপা উত্তেজনা। কে জিতবে শেষ বাজি। শুধু সতীশবাবুর এক কথা, অপূর্বকে কেউ মারতে পারবে না। যে অঙ্কে একশোয় একশো পায় সে জিনিয়াস। অপূর্ব এই সাফল্যে অঙ্কের স্যার সতীশবাবু তাঁর উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেন না।

আর মাস খানেক বাকি আছে পরীক্ষা। অপূর্ব একদিন তার কাকার সঙ্গে যাচ্ছে কলকাতায়। কিছু সাজেশন কেনার জন্য। খুব ভোরে উঠে বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। প্রথম বাসটা ধরতে হবে। হঠাৎ দেখে একটা ছেলে সাইকেল চালিয়ে দূর থেকে আসছে। সামনের থলি আর কেরিয়ারে একগাদা খবরের কাগজ। ভোরের প্রথম গাড়িতে কাগজ ঢুকেছে। স্টেশন থেকে নিয়ে আসছে।

কাকা, অনেকটা পথ। একটা খবরের কাগজ কেন না।

এ্যাই ভাই, বলতেই সাইকেলটা থামে। ছেলেটা মুখ ঘোরাতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল অপূর্ব। অতনু!

ভোরবেলা উঠে কাগজ বিক্রি করছে!

সাইকেল ঘুরিয়ে ওদের সামনে এল অতনু।

একটা কাগজ দাওতো ভাই।

কাগজ দিয়ে পয়সা নিল অতনু। অপূর্বর দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসল। তারপর সাইকেল ঘুরিয়ে চলে গেল।

চিনিস নাকি?

আমাদের স্কুলে পড়ে।

বাসে জানলার ধারে বসেছে অপূর্ব। কুয়াশার চাদর ছিঁড়ে ভোরের আলো সবেমাত্র ফুটেছে। এখনও শীতের আমেজটা আছে। ঝিরঝিরে একটা বসন্তের ভালোলাগার বাতাস এসে লাগলো অপূর্বের চোখে মুখে। মেঘহীন নীলাকাশে পাখিরা ডানা মেলে উড়ে চলেছে অজানা পথে। এইসব দেখছে অপূর্ব। শুধুই দেখছে। মন তার ডুবে গেছে এক অজানা দুশ্চিন্তায়।

অতনু কাগজ বেচছে কেন? তার মানে খুব ভোরে উঠে অপূর্ব যখন পড়া তৈরি করে তখন অতনু বাড়ি বাড়ি কাগজ দিয়ে বেড়ায়। অপূর্ব আর অতনুর মধ্যে ফাইন্যাল পরীক্ষায় একটা ডুয়েল হতে চলেছে এ খবর তো স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে পাড়ায় পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে গেছে।

তবে কি অতনুদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়! অপূর্বরা বড় লোক। এমন কি প্রতিমাসে তার বাবা ছাতনা হাইস্কুলকে পাঁচ হাজার টাকা করে ডোনেশন দেয়।

অতনু প্রায়ই স্কুলে টিফিন আনে না। অপূর্ব নিজের টিফেন থেকে কয়েকবার দিতে গিয়েছিল। শরীর খারাপের অজুহাতে খায়নি। তবে কি টিফিন আনার.....

কাকা, দুটো সেট সাজেশন কিনতে হবে।

দুটো কি হবে?

আমার এক বন্ধু আনতে বলেছিল।

বাড়ি ফিরে পড়তে বসে অপূর্ব। কিন্তু কিছুতেই মন বসে না। অতনুর সকালের ম্লান হাসি মুখটা বারবার মনে ভেসে ওঠে। ছটফট করতে থাকে অপূর্ব।

পরদিন বেলার দিকে সাইকেল নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে সে। সোজা সরদার পাড়া। একটা কৌতুহলের নিরসন করতে হবে।

ভাই, অতনু সরদারের বাড়ি কোনটা?

অতনুদা। সামনের মন্দিরের পাশ দিয়ে বাঁ দিকের শেষ বাড়িটা।

মাটির বাড়ি। দুটো ঘর। মাথায় টালির ছাদ। বেশ কয়েকটা জায়গা খসে পড়েছে। বহুদিন মেরামত হয়নি দেখলেই বোঝা যায়। বাইরে থেকে ডাকে অপূর্ব - অতনু।

বাইরে বেড়িয়ে অপূর্বকে দেখে অবাক হয় অতনু।

বায়োলজির একটা ব্যাপার নিয়ে তোমার সঙ্গে ডিসকাস্ করতে এলাম।

কি যেন ভাবল অতনু। তারপর বলল, ভেতরে এস।

ঘরে ঢুকেই অতনুদের সংসারটার হাল বুঝে যায় অপূর্ব। চারদিকে দারিদ্রের ছাপ। অপূর্ব যে তাদের পরিবেশটা দেখছে বুঝতে পারে অতনু।

কোন চ্যাপ্টারটা?

বটানি পার্টের কিছু জায়গা। তবে তুমি যদি ফ্রি থাক।

না, না। আমিও তো পড়ছিলাম। কোন অসুবিধা হবে না। আলোচনা শুরু হয় দুই বন্ধু। পড়াশুনা নিয়ে। যাবার আগে অপূর্ব বলে, এটা তোমার কাছে রাখ।

কি এটা?

সাজেশন।

হাতে নিয়ে দেখে অতনু বলে, কিন্তু এটা যে অনেক দাম!

দাম লাগবে না। বন্ধুত্বের বিচার সব সময়ে দাম দিয়ে হয় না। কলকাতার নামি দামি স্কুলের শিক্ষকদের তৈরি করা সাজেশন। ওটা তোমার কাজে লাগবে। আমার কাছে আর এক কপি আছে। আর হ্যাঁ, তোমার আমার ডুয়েলটা সকলের কাছে চাউর হয়ে গেছে। আমি কিন্তু এতে কোন প্রতিযোগিতা দেখছি না। যাই হোক, আমাদের বন্ধুত্ব যেন অটুট থাকে। আসি ভাই।

অপূর্ব কিন্তু অনেক খবরই সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে। অ্যাক্সিডেন্টে বাবা পঙ্গু। মা লোকের বাড়িতে কাজ করে যা সামান্য টাকা পান তাই দিয়ে সংসার চলে। পড়াশুনা চালাতে তাই অতনুকে খবরের কাগজ বিক্রি করতে হয়।

রমেন, দিবাকর, বিশ্বনাথ কেউ জানে না, আমরা যখন শীতের সময় লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমাই কিংবা পরীক্ষার পড়া তৈরি করি, তখন শীতে কাঁপতে কাঁপতে অতনু লোকের দোরে দোরে কাগজ বিক্রি করে।

একটা অস্বস্তি যেন অপূর্বকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। শুধু পড়াশুনায় নয়, স্কুলের ফুটবল টিম তাকে ছাড়া হবে না। ডিস্ট্রিক্টটে 'সাধারণ জ্ঞান' প্রতিযোগিতায় এবার সে প্রথম হয়েছে। দুর্দান্ত আবৃত্তি করে। তবু আপাত নিরীহ একটা ছেলে যেন কোথায় তাকে হারিয়ে দিচ্ছে। হারতে সে শেখেনি। সে চ্যাম্পিয়ান। এটা সকলকে সে বুঝিয়ে দেবে।

স্কুলে দারুণ ভিড়। আজ উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট। এগারোটায় লিস্ট টাঙাবে, রেজাল্ট পেতে পেতে চারটে হয়ে যাবে। দশটার মধ্যেই সবাই স্কুলে এসে হাজির। কী হবে তাই নিয়ে একটা গুঞ্জন উঠে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

ঠিক এগারোটার সময় বাংলার স্যার দীপেনবাবু স্কুলের বোর্ডে লিস্ট টাঙালেন। প্রত্যেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। প্রত্যাশা ছাড়িয়ে প্রত্যেকে আরও ভালো ফল করেছে। কিন্তু লিস্টে তো অপূর্ব আর অতনুর নাম নেই।

এবার এগিয়ে এলেন হেডস্যার। সকলের মধ্যে থেকে অপূর্ব ও অতনুকে কাছে ডেকে নিলেন। তারপর সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, স্কলারশিপের জন্য ডুয়েলেই হয়েছে বলতে পার। অপূর্ব আর অতনু দুজনেই নব্বই শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে। তবে অপূর্বকে পিছনে ফেলে অতনু স্কলারশিপ্ পেয়েছে। অপূর্বর মোট নম্বরের চেয়ে অতনু নয় নম্বর বেশি পেয়েছে। প্রত্যেক বিষয়ে কে কত পেয়েছে তা রেজাল্ট এলে পরে জানতে পারা যাবে। স্কুলের পক্ষ থেকে অতনুকে সংবর্ধনাও দেওয়া হবে।

বিস্ময়ের ঘোর যেন কারো কাটতে চাইছে না। লড়াইটা অপূর্ব আর অতনুর মধ্যে তা তো সকলের জানা। কিন্তু স্কুলের শিক্ষক থেকে ছাত্র পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না অপূর্বকে পিছনে ফেলে অতনু টপার হয়েছে। একটা জানা উত্তর যেন সকলের ভুল হয়ে যাচ্ছে।

প্রথম ধন্যবাদটা অপূর্বই অতনুকে জানায়। তারপর একে একে সকলে অভিনন্দনের বন্যায় ভাসিয়ে দেয় অতনুকে।

চারটেয় রেজাল্ট পাওয়া যাবে। অতক্ষণ ছাত্ররা সব স্কুলে অপেক্ষা করবে। হেডস্যার সকল পরীক্ষার্থীর জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করলেন।

রেজাল্টে যেন আরও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল সবার জন্য। অপূর্ব অঙ্কে পঁচাশি পেয়েছে আর অতনু পেয়েছে নব্বই। এই প্রথমবার কেউ স্কুলে অপূর্বের চেয়ে অঙ্কে বেশি পেল। অতনুকে নিয়ে সকলে উচ্ছ্বাস দেখাতে লাগল। শিক্ষকেরা বড় হওয়ার আশীর্বাদ করলেন। শুধু সতীশবাবু বারবার মাথা নেড়ে 'এ কি করে হয়, এ কি করে হয়' বলতে লাগলেন। যে ছেলে টেস্টে অঙ্কে ফুলমার্কস পায় তার ফাইন্যালে এই দশা।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে স্কুল প্রাঙ্গণ ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে গেল। অপূর্ব ধীর পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটছিল। বাসস্ট্যান্ডের কাছে হঠাৎ শুনলো- অপূর্ব।

চমকে ফিরে দ্যাখে অঙ্কের শিক্ষক সতীশবাবু।

- স্যার

তুমি অঙ্কে পঁচাশি! রিভিউ করতে দাও।

তাতে কোন ফল হবে না স্যার।

কেন? তুমি সিউর পনেরো নম্বর তুমি ভুল করে এসেছ?

ভুল করিনি তো!

ভুল করোনি? এবার অবাক হবার পালা সতীশবাবুর।

এর মানে কী?

আমি স্যার পঁচাশি নম্বরের উত্তর করে এসেছিলাম। অঙ্ক আমার কাটা যায়নি।

উফ্ অপূর্ব, জীবনের এতবড় একটা পরীক্ষায়-

জিততে চেয়েছিলাম স্যার। আর না হেরে আমার জেতার কোন উপায় ছিল না। অতনুর বাড়ি যদি কখন যান তবে বুঝতে পারবেন।

জানি। অতনুকে ওর বাড়ি গিয়ে কয়েকবার অঙ্ক করিয়ে এসেছি। কিন্তু তুমি আজ যা করেছ কোন মূল্য দিয়েই তার বিচার করা চলে না। তুমি আমাদের গর্ব অপূর্ব, দেশের গর্ব।

ছেঁড়া ছেঁড়া একটা আলো এখনও আকাশে রয়ে গেছে। সেই আলো-আঁধারের মধ্যে অপূর্ব দেখল সতীশবাবুর চেখে জল। তারও দুচোখে ছাপানো জল গাল ভিজিয়ে দিচ্ছে।

অঙ্কের স্যার এগিয়ে এসে ডান হাত দিয়ে অপূর্ব মাথা স্পর্শ করে বললেন, বেঁচে থাকো বাবা, বড় হও।

অপূর্ব মাথা হেঁট করে স্যারকে প্রণাম করল। তারপর নিজের গন্তব্যর দিকে এগিয়ে গেল।

স্যার দেখলেন, ঐ যে তার প্রিয় ছাত্রটি যাচ্ছে। হেরেও যে আজ সকলের অলক্ষ্যে জিতে গেছে। যে নিজে থেকে দ্বিতীয় হতে না চাইলে তাকে কেউ দ্বিতীয় করতে পারত না।

নেতা এবং বিদ্বান মানুষদের মধ্যে একজন মেরুদণ্ডী প্রাণী নেই যিনি বলতে পারেন যে এখানে অসুবিধা হলে তোমরা ইসলামিক রাষ্ট্র অর্থাৎ নিজের দেশে চলে যাও। বলতে পারে না জিন্নার অন্তিম ইচ্ছাকে সম্মান দিয়ে লোক বিনিময় করে নাও। চিরদিনের জন্য ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সংস্যার সমাধান হয়ে যাক। ***—শিবপ্রসাদ রায়***

বিস্মৃত এক ভারতরত্ন ঃ রবীন্দর কৌশিক—''দ্য ব্ল্যাক টাইগার অফ ইন্ডিয়া''

রাজা দেবনাথ

আজ এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি, যেখানে চতুর্দিকে শুধুই স্বার্থান্ধ সংকীর্ণমনা মানুষের ভিড়। দেশদ্রোহীর দল যেখানে চারপাশে থিকথিক করেছে, তা সত্ত্বেও দেশের ভেতর এবং বাইরে একশ্রেণির এমন কিছু বিরল দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্বের নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়, যাদের দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। ভারতবাসী হিসেবে যাদের আত্মত্যাগের ঋণ পরিশোধ করা এক কথায় অসম্ভব। তাই হয়তো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই সাত তাড়াতাড়ি এদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়।

তেমনই একজন বিস্মৃত মহানায়ক হলেন, ''দ্য ব্ল্যাক টাইগার''। দেশের ভুলে যাওয়া এক প্রকৃত হিরো, যিনি দেশ ছেড়েছিলেন দেশসেবার জন্যে। আমীর খানের মত রোজ ৩ কোটি কামানোর পরও দেশকে বিশ্ববাসীর সামনে কলঙ্কিত করবার জন্যে নয়।

তিনি রবীন্দর কৌশিক।

ক'জন মানুষ তাঁর নাম শুনেছেন? বা তাঁর সম্পর্কে এক লাইনও জানেন?

আসুন আজ এমনই এক বিস্মৃত মহান দেশপ্রেমিকের সঙ্গে আপনাদের সকলের পরিচয় করিয়ে দিই। আলাপ করিয়ে দিই এমন এক অসমসাহসী ব্যক্তিত্বকে যিনি প্রকৃত অর্থেই আমৃত্যু 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে স্বীয় লক্ষ্য পূরণে অবিচল থেকেছেন। নিঃশেষে দেশমাতৃকার স্বার্থে নিজের প্রাণ সঁপে প্রকৃত অর্থেই যিনি হয়ে উঠেছেন এ যুগের দধীচি।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮৩ সাল এই সুদীর্ঘ আট বছর কৌশিক , ''দ্য ব্ল্যাক টাইগার'' কোড নামে RAW এর একজন এজেন্ট হিসেবে পাকিস্তান শত্রুপুরী'তে নিখুঁতভাবে সক্রিয় থেকেছেন। পরিশেষে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে ঐ দেশেই ঘটনাচক্রে একসময় ধরা পড়ে বন্দী হন এবং সেখানেই তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

হরিয়ানার কারনাল শহরের শ্রীগঙ্গানগরে ১৯৫২ সালের ১১ই এপ্রিল জন্ম নেন রবীন্দর। প্রথম জীবনে থিয়েটার অভিনেতা হিসাবে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন তিনি। সেই সময়ই মাত্র ২১ বছর বয়সে অংশ নেন লখনৌ'য়ে আয়োজিত জাতীয় ড্রামা মীটে। এখান থেকেই গোটা জীবনটা তাঁর অন্যদিকে মোড় নেয়। কারণ এই নাট্য সম্মেলনেই তিনি ভারতের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা এবং গুপ্তচর সংস্থা ''রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং'' (RAW)-এর কিছু পদস্থ অফিসারের চোখে পড়ে যান। তাঁর অভিনয় কুশলতা দেখে RAW তাঁকে এজেন্ট হিসাবে পাকিস্তানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। নিজের জীবনের কথা না ভেবে সাথেসাথেই ভারতমাতার দুধের ঋণ শোধ করতে রাজী হয়ে যান তিনি।

RAW-এর আন্ডারকভার হিসাবে পাকিস্তানে যখন তিনি নিয়োজিত হন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩। তাঁকে দিল্লীতে ''RAW'' এর অধীনে দুবছরের কঠোর এবং গোপন প্রশিক্ষণ নিতে হয়। কেমন ছিল সেই প্রশিক্ষণ? প্রথমেই সুন্নৎ করানো হয় তাঁকে, ধর্মান্তরিত হয়ে হতে হয় মুসলমান, যাতে তাঁর মুসলিম পরিচয় সম্পর্কে কারো সন্দেহ না থাকে। এরপর মুসলিম ধর্ম সম্পর্কে সমস্ত খুঁটিনাটি বিশদে জানানো হয়। শিখতে হয় উর্দু এবং স্থানীয়ভাবে কাজ চালানোর মতন বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষাও। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীগঙ্গানগরে বড় হয়ে ওঠার সুবাদে কৌশিক এমন কিছু ভাষা ইতিমধ্যেই জানতেন, যা ছিল পাকিস্তানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কথ্য ভাষা। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তাঁকে সেদেশের ভৌগলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কেও পারদর্শী করে তোলা হয়।

এরপর ১৯৭৫-এর এক ঝড়-জলের রাতে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে বেড়িয়ে পড়েন কৌশিক। প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যে কচ্ছের রান এবং পাকিস্তানের বর্ডার গার্ডদের চোখে ধুলো দিয়ে শত্রুদেশের মাটিতে পা রাখেন তিনি। নতুন নাম নেন নবি আহমেদ শাকির। ছদ্মনাম ও ছদ্ম পরিচয়ে শুরু হয় এক নতুন জীবন।

মারাত্মক ঝুঁকির মুখে একা একাই অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে স্নাতক হয়ে, একজন সিভিলিয়ান ক্লার্ক রূপে যোগ দেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে। পরবর্তীকালে নিজ প্রতিভার গুণে ধীরে ধীরে উঠে আসেন সেনাবাহিনীর একেবারে উপরের স্তর মিলিটারি একাউন্টস ডিপার্টমেন্টে। অবিশ্বাস্য ভাবে মাত্র ৪ বছরেই তিনি হয়ে ওঠেন পাক সেনাবাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ মেজর। সে সময় বিয়েও করেন ''আমানত'' নামের এক স্থানীয় মেয়েকে। আমানতের আব্বা ছিলেন পাকিস্তানেরই অপর একটি আর্মি ইউনিটের দর্জি। তাদের একটি পুত্র সন্তানও জন্মলাভ করে।

এরই পাশাপাশি অত্যন্ত গোপনে এবং নিঃশব্দে চলতে থাকে তাঁর RAW-এর কাজ। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে পাক সরকার ও সেনাবাহিনীর অনেক ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

ভারতে পাঠান তিনি। বহুবার তাঁর পাঠানো তথ্যের জেরেই পাক সেনা ও জঙ্গিদের বিভিন্ন হামলা ও সন্ত্রাসের পরিকল্পনা বানচাল করতে সমর্থ হয় ভারত।

তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং তাঁর সাঙ্কেতিক নাম দিয়েছিলেন- ''দ্য ব্ল্যাক টাইগার''। এই হল রবীন্দরের টাইগারে রূপান্তরিত হবার সংক্ষিপ্ত আখ্যান।

তিনি অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ২৬টা বছর শত্রুদেশের মাটিতে কাটিয়েছেন। একের পর এক ষড়যন্ত্র রচনা করেছেন দুশমনের বিরুদ্ধে। তার মধ্যেও নিজের আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, চিঠিপত্র আদানপ্রদান করেছেন।

একজন সিনিয়ার পাকিস্তানী সেনা অফিসার হবার সুবাদে, পাক সেনাবাহিনীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি সম্পর্কে তিনি সহজেই অবহিত হতে পারতেন। ফলতঃ রবীন্দরের পাঠানো গোপন তথ্যই একটা সময় ভারতকে কৌশলগত ভাবে পাকিস্তানের সমর পরিকল্পনার দিক থেকে সর্বদাই এককদম এগিয়ে রাখত। এমনকি তাঁর প্রেরিত আগাম হামলার বার্তায় বহুবার রাজস্থান সীমান্তে পাকিস্তানের যুদ্ধের চাল আমূল ভেস্তে গেছে। কিন্তু ১৯৮৩ সালের শেষের দিকে নেমে আসে বিপর্যয়।

''ব্ল্যাক টাইগার'' এর কাজে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে ৮৩'র সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান পাড়ি দেন RAW এরই আর এক লো লেভেল এজেন্ট ইনায়েত মসীহা। দুর্ভাগ্যক্রমে তার সাথে তথ্য বিনিময় করার সময় ক্ষণিকের সামান্য ভুলের জন্য ধরা পড়ে যান মসীহা। ফলে ''ব্ল্যাক টাইগার'' এর আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যায় পাকিস্তানী সেনার কাছে। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরেই গ্রেপ্তার হন কৌশিক। তাঁকে শিয়ালকোটের জেলে দুবছর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অন্তরীন করে রাখা হয়, কিন্তু তথাপি ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সের কোন খবর বার করতে না পেরে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মুলতানের কারাগারে। ১৯৮৫তে তাঁর মৃত্যুদন্ড দেয় পাকিস্তান সরকার, যা পরবর্তীকালে সেদেশের সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ পাল্টে গিয়ে যাবজ্জীবন সাজায় রূপান্তরিত হয়।

শুরু হয় তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার। কিন্তু একটাও কথা বের করতে না পারার রোষে, এক-দুই বছর নয়, টানা ১৮ বছর ধরে শিয়ালকোট, লাখপত এবং মিলানওয়ালি জেল সহ পাকিস্তানের একাধিক কারাগারে তাঁর উপর নারকীয় বর্বরতা চালানো হয়। তিনি যাতে ঘুমাতে না পারেন, তাই তাঁর চোখের পাতাদুটি কেটে নেওয়া হয়, ফলে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারান। পাশাপাশি ছিন্ন করা হয় তাঁর গোপনাঙ্গ। এমনকি উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা তাঁর কানের পর্দাও ফুটো করে দেওয়া হয়।

তাঁর উপর চালানো হত কেমিক্যাল টেস্ট। বের করে নেওয়া হয়েছিল তাঁর একটা কিডনিও। অবশেষে গত ২৬শে জুলাই ১৯৯৯ সালে মাত্র ৪৭ বছর বয়েসেই অ্যাস্থমা, যক্ষা এবং হৃদরোগের যুগপৎ আক্রমণে সংক্রামিত হয়ে মুলতানের নিউ সেন্ট্রাল জেলেই তিলে তিলে মৃত্যু হয় তাঁর। সরকারী নথি অনুযায়ী সেই জেলের পিছনেই কবরস্থ করা হয় এই বীর শহীদকে।

ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, মৃত্যুর পর এমন এক ভারতশ্রেষ্ঠ সন্তানের প্রতি ভারত সরকারের অকৃজ্ঞতার বহর দেখে। সামান্য কিছু অর্থ পেনশন হিসেবে তাঁর পিতামাতার হাতে তুলে দিয়ে তারা তাদের হাত ধুয়ে ফেলেছেন! শুরুতে মাসিক মাত্র ৫০০ টাকা দিয়ে শুরু করে ২০০৬ এ তাঁর রত্নগর্ভা জননী শ্রীমতী অমলা দেবীর দেহত্যাগের সময় যা গিয়ে দাঁড়ায় কেবল ২০০০ টাকায়।

দেশের এই প্রকৃত বীরকে আজ আমরা ভুলে গেছি। তাঁর নামটাও হয়তো আমাদের অনেকেরই জানা নেই। তিনি ভারতমাতার সত্যিকারের কালো বাঘ শ্রী রবীন্দর কৌশিক। ২০১২ সালে বলিউড ''এক থা টাইগার'' সিনেমাটি তার জীবনের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে তাঁর মতো চরিত্রের অভিনেতা সত্যিই দুর্লভ।

আজও মৃত্যুর আগে পারিবারিক স্বজনদের কাছে তাঁর পাঠানো চিঠিগুলো সকলের মন ভারাক্রান্ত করে তোলে। এতো চিঠি নয়.....যেন নৃশংস মানবাধিকার লঙ্ঘনের একেকটা জীবন্ত দলিল। সেখানে ছত্রে ছত্রে সাজানো সে সব ভয়ঙ্কর আতঙ্কের চিত্রে, যা তাঁর অসুস্থ শরীরকে প্রতি মুহূর্তে খুবলে খুবলে খেত। "Had I been an American, I would have been out of this jail in three days, Kya Bharat jaise bade desh ke liye kurbani dene waalon ko yahi milta hai?".....''আমি যদি আমেরিকান হতাম তবে হয়তো তিনদিনের মধ্যেই এই জেলখানা থেকে আমি বেরিয়ে আসতাম। ভারতের মত একটি বিরাট দেশের জন্যে কুরবানি দেবার এই বুঝি পুরস্কার?" প্রশ্ন করেছিলেন, এক রাশ নিদারুণ বিরক্তি আর চাপা অভিমান বুকে নিয়ে।

ব্ল্যাক টাইগার, রবীন্দর কৌশিক তাঁর এই মহান বলিদানের বিনিময়ে ভারত সরকারের কাছে থেকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ছাড়া আর কি-ই বা পেয়েছেন?

আমরাও বুঝি এতটাই অকৃতজ্ঞ?

আসুন এই বীরশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিককে আজ হৃদয়ের মণিকোঠায় চিরশ্রদ্ধার আসনে আসীন করি। হারিয়ে যাওয়া ভারতমাতার এই বীর সন্তানকে জানাই কোটি কোটি প্রণাম। সঙ্গে প্রণাম জানাই দেশের সকল সেনা, পুলিশ এবং গোয়েন্দাদের যারা আমাদের সুরক্ষায় রোজ প্রতিনিয়ত নিজেদের জীবন ও পরিবারকে বাজি রেখে কাজ করে চলেছেন।

বন্দে মাতরম....। ভারতমাতা কি জয়.....।।

বুদ্ধির পরীক্ষা

সমীর গুহরায়

(আজ থেকে প্রায় ৬০০ বছর আগে এই কাহিনীর প্রেক্ষাপট। দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরের রাজা তখন কৃষ্ণদেব রায়। প্রেক্ষাপট ঐতিহাসিক, চরিত্রও ঐতিহাসিক। কিন্তু এ কাহিনীর বিষয়বস্তু ইতিহাস নয়। রাজাদের জীবনেও অনেক সাধারণ ঘটনা ঘটত। সেইরকমই এক বিষয় নিয়ে রচিত এ গল্প)

দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরে তুলুভ বংশীয় রাজা কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। শৌর্যে-বীর্যে তিনি ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি বাহমনী সুলতানকে পরাজিত করে কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা নদীর দোয়াব অঞ্চল নিজ সাম্রাজ্যের অধীনে আনেন। তাঁর আমলে পুরো দক্ষিণাত্যে প্রভুত্ব করছে বিজয়নগর। শুধু বিজেতা হিসাবেই রাজা কৃষ্ণদেব খ্যাতি অর্জন করেননি, তিনি দেশে এক সুশাসনও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিজয়নগরের সমৃদ্ধির কথা বিখ্যাত বিদেশী ঐতিহাসিক নিকোলো কন্টির বিবরণে পাওয়া যায়।

কিন্তু সবদেশেই কিছু খারাপ লোক, চোর-ডাকাত থাকবেই। তাই দেশে চুরি-ডাকাতি বন্ধ করতে রাজা কৃষ্ণদেব কঠোর আইন করলেন। আজীবন কারাবাস কিংবা মৃত্যুদন্ডের মতো বিধান দিলেন তিনি। চোর-ডাকাত পড়ল মহা ফ্যাসাদে। চুরি-ডাকাতি বন্ধ হল। এমনকি দেশে যাদের চোর-ডাকাতের বদনাম আছে তারা আতঙ্কে দিন কাটাতে লাগল। এই বুঝি রাজার প্রহরী এসে তাদের বন্দী করে।

বিজয়নগরে দুইজন দুধর্ষ চোর বাস করত। তারা একসঙ্গে অনেক চুরি করেছে, কিন্তু কখনও ধরা পড়েনি। দেশে এইরকম কঠোর আইন হতে তারাও প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পড়ল।

একদিন রাজা কৃষ্ণদেব সিংহাসনে বসে সভার কাজ পরিচালনা করছেন, তখন ঐ দুজন চোর তাঁর সভায় এসে উপস্থিত হল। রাজা তাদের আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন দুইজন একসঙ্গে বলে উঠল, প্রভু, আমাদের অপরাধ নেবেন না। আমরা চোর। বিজয়নগরের অনেক লোকের ধন-সম্পত্তি আমরা চুরি করেছি। এ যে অত্যন্ত গর্হিত কাজ তা আমরা বুঝতে পেরেছি। ভবিষ্যতে আমরা কোনদিন চুরি করবো না, এ প্রতিজ্ঞা করছি। প্রভু যেন এবারকার মতো আমাদের মাফ করে দেন।

কৃষ্ণদেব পড়লেন ভারী মুশকিলে। চুরির অপরাধে কঠিন শাস্তির বিধান তিনি করেছেন। কিন্তু চোর নিজে থেকে এসে যদি অপকটে তার অপরাধ স্বীকার করে মার্জনা প্রার্থনা করে, তবে তাকে কী করে শাস্তি দেওয়া যায়? রাজা ভাবতে বসলেন।

ভাবতে ভাবতে রাজার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। নগরের উপকণ্ঠেই থাকেন তেনালি রামা নামক এক ধনী ব্যবসায়ী। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ বলে খ্যাতি আছে। একবার তেনালির বুদ্ধির জোর কত তা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

তিনি চোরেদের বললেন, তোমরা চতুর ও দুধর্ষ চোর বলেই শুনেছি। তোমাদের একটা কাজ করতে হবে। তেনালি রামার বাড়িতে তোমাদের মূল্যবান গহনা, হীরে-জহর সব চুরি করতে

হবে। তবেই তোমরা মুক্তি পাবে। আর যদি ধরা পড়ে যাও তবে নিশ্চিত কারাবাস হবে।

চোর দুজনই রাজার এই কথায় কিছুটা অবাক হলেও রাজার দেওয়া শর্তে রাজি হয়ে গেল। অনেক ধনীর গৃহে সুকৌশলে চুরি করে তারা পালিয়েছে। পাহারা থাকা সত্ত্বেও তাদের টিকিটি কেউ ছুঁতে পারেনি। আর কোন এক তেনালি রামার বাড়ি চুরি করা তো তাদের বাঁ হাতের খেল।

দুদিন পর রাতের বেলা চুপিচুপি তারা তেনালি রামার বাড়িতে উপস্থিত হল। গেট দিয়ে ঢুকেই সামনে এক প্রকান্ড বাগান। তারা একটা বড় ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা গাছের পিছনে লুকিয়ে রইল।

প্রতিদিন রাতের খাবারের আগে তেনালি পা ধোয়। সে পা ধুতে এসে দেখতে পেল দুজন লোক বাগানে ঢুকেছে। বুদ্ধিমান তেনালি বুঝতে পারল এরা অবশ্যই চোর। সে যথেষ্ট ধনী। তাই তার বাড়িতে চোর আসাটা অসম্ভব নয়।

চট করে তার মাথায় একটা প্ল্যান এল। সে বাগান থেকেই চিৎকার করে তার স্ত্রীকে বলতে লাগল, শুনছ! আজকে রাতে আমাদের পাড়ায় চোর আসতে পারে। আমাদের যত গহনা ও দামি হীরে-জহরত আছে সব একটা পুঁটলি করে বাড়ির পিছনে যে কুয়ো আছে সেখানে রেখে দাও। চোর ভাবতেও পারবে না যে আমরা আমাদের বহু মূল্যবান গহনাগুলি ঐ রকম একটা নোংরা জায়গায় লুকিয়ে রাখতে পারি।

চোরেরা তেনালির সমস্ত কথা শুনল। প্রথমজন বলল, আরে এ দেখছি তেনালি রামাই আমাদের কাজ সহজ করে দিল। রাত একটু বাড়লে কুয়ো থেকে গহনা তুলে আমরা চম্পট দেব।

দ্বিতীয়জন বলল, সত্যি ভাই। এত সহজে যে কাজ হাসিল হবে তা ভাবতেও পারিনি। কাল থেকে আমরা মুক্ত।

তেনালি রামা পা ধুয়ে তাড়াতাড়ি করে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। গহনাগুলো আর দামি আসবাবপত্র একটা গোপন জায়গায় সরিয়ে ফেলল। তারপর একটা বড় কাপড়ে বেশ কয়েকটি ভাঙা ইঁট রেখে ভালো করে পুঁটলি বেঁধে চুপিচুপি কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে এল।

চোরেরা গাছের আড়াল থেকে সব দেখল। প্রথমজন বলল, একটু সবুর কর ভাই। তেনালি ঘুমালে পরে আমরা কাজ হাসিল করব।

একটু পরেই তেনালির ঘরের আলো নিভে গলে। তখন চোর দুজন গাছের আড়াল থেকে বেড়িয়ে নিঃশব্দে কুয়োর কাছে এল। দ্বিতীয় চোরটি বলল, ভাই, তুমি তেনালির ঘরের দিকটা পাহারা দাও, আমি ততক্ষণ গহনার পুঁটলি খুঁজে বের করছি।

বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পরও গহনার পুঁটলি পাওয়া গেলনা। প্রথমজন অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, কিরে, পেয়েছিস?

- না

- ভালো করে খোঁজ।

কিছুক্ষণ পর কুয়ো থেকে বেড়িয়ে দ্বিতীয়জন বলল, ভাই, অনেক করে খুঁজেও সেই পুঁটলির সন্ধান পেলাম না।

আমার মনে হয় কুয়োর জল খালি করলে গহনার সন্ধান পাওয়া যাবে।

চল, জল ছ্যাঁচা যাক।

তখন দুইজনে মিলে বহু কষ্টে কুয়ো থেকে জল তুলতে লাগল।

দীর্ঘসময় জল তোলায় তারা দুজনেই বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে জলের তল কিছুটা নামায় প্রথম জন কুয়োর মধ্যে নামল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একটা পুঁটলি হাতে করে উঠে এল।

পুঁটলি দেখে আনন্দে দুজনেই নৃত্য করতে লাগল। যাক অবশেষে তারা সফল হয়েছে। এই গহনা রাজার হাতে তুলে দিতে পারলেই শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

পুঁটলি খুলতেই দুই চোরের চক্ষু চড়কগাছ। কোথায় গহনা? এতো ভাঙা ইঁটের টুকরো। তেনালি তাদের মোক্ষম বোকা বানিয়েছে। বিপদ বুঝতে পেরে তারা পিছন ফিরে চম্পট দিল।

তেনালি রামা আলো নিভালেও শুয়ে পড়েনি। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল চোরেদের কীর্তি। চোরেরা যখন পালাতে শুরু করল তখন চিৎকার করে সে আশেপাশের লোক জড়ো করে ফেলল। ব্যাস্ চোরেরা আর পালাতে পারল না।

পরেরদিন রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সভায় তেনালি রামা চোরেদের নিয়ে উপস্থিত হল। গতরাতের সমস্ত কথা উল্লেখ করে রাজার কাছে ন্যায় বিচার চাইলেন। রাজা তো চোরেদের দেখেই চিনতে পেরেছেন। শর্তপূরণ করতে না পারায় কৃষ্ণদেব চোরেদের কারাবাসের হুকুম দিলেন। তেনালি রামার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করতেও তিনি ভোলেন নি।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

শিবস্থানে গোহত্যার চেষ্টা রুখে দিল জীবনতলার হিন্দু যুবকেরা

শিবস্থানে গোহত্যায় ব্যর্থ হয়ে ক্ষিপ্ত মুসলিম জনতা হিন্দু গ্রাম ঘেরাও করলো। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার মল্লিকআটি সংলগ্ন মৌজিপাড়া। আজ সকালে স্থানীয় কয়েকজন মুসলমান মৌজিপাড়ার একটি শিবস্থানে গরু জবাই করার চেষ্টা করে। স্থানীয় হিন্দু সংহতির ছেলেরা বাধা দিলে সংঘর্ষ হয় এবং শিবস্থানে গোহত্যার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তখন ওখান থেকে কিছুটা দূরে রাস্তার উপরে গরুটিকে কাটা হয়। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তখনকার মত পরিস্থিতি সামাল দেয়। কিন্তু বিকেলবেলা আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মুসলমানরা ঘটনাস্থলে জমায়েত হতে শুরু করে। হিন্দু সংহতির স্থানীয় নেতৃত্বও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য পুলিশ এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা মাঠে নামে। এই মুহূর্তে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী এলাকায় শ'তিনেক মুসলমানের জমায়েত আছে। কয়েকজন পুলিশ কর্মীও মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকার হিন্দুরা আতঙ্কিত। প্রসঙ্গত, মাস দুয়েক আগেই সেই শিবস্থান থেকে শিবলিঙ্গটি চুরি হয়ে গিয়েছিল। ফলে স্থানীয় লোকেরা এই ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত বলেই মনে করছে।

কলকাতার কাছেই দুটি বিরাট অস্ত্রাগারের হদিশ পেল পুলিশ

কলকাতার কাছেই অস্ত্র বানানোর কারখানার হদিশ পেল পুলিশ। মহেশতলা সংলগ্ন রবীন্দ্রনগর থানার কানখুলি এলাকা থেকে পুলিশ উদ্ধার করল ১০১টি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র। উদ্ধার হয়েছে অস্ত্র তৈরির মেশিন। গ্রেফতার বিহারের বাসিন্দা মাস্টারমাইন্ড আফতাব হোসেন সহ পাঁচ।

কিছুদিন আগেই পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার একাধিক জায়গায় অস্ত্র কারবার চলছে। জেলাতে বসেই অস্ত্র তৈরি করে বিক্রিও করা হচ্ছে। তারপরেই দুষ্কৃতিদের খোঁজে দঃ ২৪ পরগণা পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরির নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম তৈরি হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, নিজাম এই অস্ত্র কারবারের চক্রে সেলার ছিল। নিজামের সূত্র ধরে পুলিশ পৌঁছায় সেলিম মোল্লার কাছে। সেলিমও সেলার হিসাবে কাজ করত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্র বিক্রি করার মূল দায়িত্ব ছিল সেলিম ও নিজামের। রবীন্দ্রনগর থানার কানখুলি এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে অস্ত্র তৈরি করা হত। কারিগর ছিল মহম্মদ আসলাম ও মহম্মদ এফসান। এরপরেই পুলিশ স্পেশাল এসওজি গ্রুপকে নিয়ে তল্লাশি চালিয়ে গ্রেফতার করে অস্ত্র কারবারের মূল পান্ডা বিহারের ভাগলপুরের বাসিন্দা আফতাব হোসেনকে। রবীন্দ্রনগরে ঘর ভাড়া করে সে অস্ত্র তৈরির কারবার চালাত। কারিগরদের আনা হত বিহার থেকে।

পুলিশ অস্ত্র কারখানা থেকে উদ্ধার করেছে, ১০১টি আগ্নেয়াস্ত্র। ৯৫টি ওয়ান শটার পাইপগান, ৪টি ডবল ব্যারেল পাইপগান, ২টি নাইন এমএম পিস্তল, ৫৭ রাউন্ড গুলি, ৭টি মোবাইল এবং নগদ ১০ হাজার টাকা। পাশাপাশি, আটক করা হয়েছে অস্ত্র তৈরির ব্যবহৃত লেদ মেশিন সহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ। পুলিশ

সুপার সুনীল চৌধুরী জানিয়েছেন, ''ধৃতদের আদালতে তুলে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজত চাওয়া হবে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ২৫র, ৩৫, ৩৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনায় আর কারা জড়িত আছে তাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হবে।'' পুলিশ জানিয়েছে, মূলত গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ, বন্দর, দুই ২৪ পরগনায় অস্ত্র বিক্রি করত আফতাব ও তার শাগরেদরা। আর কোথায় অস্ত্র তৈরির কারখানা আছে কি না, তার তল্লাশিও চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গত ২রা অক্টোবর এই জেলারই মহেশতলায় আবার একটি অস্ত্র কারাখানার হদিশ পায় পুলিশ। মহেশতলার পুরোসভার ৯নং ওয়ার্ডের মোল্লা পাড়া বস্তির একটি ভাড়া বাড়িতে চলছিল আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানা। বাড়ির মালিক মহম্মদ আকবর ওরফে শামসের আলিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। উদ্ধার হয়েছে ২২টি নাইন এম এম পিস্তল, সাতটি সেভেন এম এম পিস্তল, পাঁচটি লেদ মেশিন, একটি করে গ্যাস কাটার, ড্রিল ও পালিশ মেশিন। এই দুটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে কলকাতাতেই এখন 'মিনি মুঙ্গের' তৈরি হয়ে গিয়েছে।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

হিন্দু যুবতী নগ্ন দেহ উদ্ধার গঙ্গাসাগরে ঃ শেখ হাসানুর গ্রেফতার

মূক ও বধির তাপসী পাত্র-র বাড়ি গঙ্গাসাগর এলাকার বাইপাসের ধারে পঞ্চবটী গ্রাম। গত ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে সে নিখোঁজ। বাড়ির লোক তার সন্ধান না পেয়ে গত ৯ই সেপ্টেম্বর কোস্টাল থানায় নিখোঁজ ডাইরি করে (জিডি ২০৭)। এলাকার লোকের সাথে কথা বলে জানা যায় যে শেষবার তাপসীকে শেখ হাসানুরের সাথে দেখা গিয়েছিল। এরপরে তাপসীর পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় অভিযুক্তদের নাম দিয়েও অভিযোগ করা হয়, কিন্তু তাপসীকে খুঁজে বের করতে পারে না পুলিশ।

অবশেষে গঙ্গাসাগর বাইপাস রাস্তার ধারে তীর্থযাত্রীদের জন্যে নির্মিত একটি অস্থায়ী আশ্রমের সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার হয় তাপসীর পচাগলা নগ্ন মৃতদেহ। তাপসীর বাড়ির লোকের অভিযোগ অনুসারে পুলিশ শেখ হাসানুর, তার পিতা শেখ আনসার ও তার মা হাপিজা বিবিকে গ্রেপ্তার করলেও শেখ আনসার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মূল অভিযুক্ত শেখ হাসানুর ও তার মা এখন পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

মন্দির বাঁচাতে হাতে বন্দুক তুলে নিচ্ছেন পুরোহিতরা

মন্দিরের দামী গহনা ও বিগ্রহ বাঁচাতে হাতে বন্দুক তুলে নিচ্ছেন হিমাচল প্রদেশের বহু পুরোহিত। রাজ্য সরকার তাদের অস্ত্রের লাইসেন্সও দিয়ে দিচ্ছে। গত কয়েক বছরে হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় খুন হয়েছেন একাধিক মন্দিরের পুরোহিত ও নিরাপত্তারক্ষী। চুরি যায় একাধিক মন্দিরের বিগ্রহ ও গহনা। ২০১৩ সালে সিমলার এক গ্রামে চোররা শুধুমাত্র মন্দিরের মূল্যবান সামগ্রী চুরি করেই ক্ষান্ত হয়নি, মন্দিরের নিরাপত্তারক্ষীকেও খুন করে। গত ১০ বছরে রাজ্যের ১৫০টি মন্দিরে লুঠপাট চালিয়েছে চোররা।

রাজ্যের কুলু জেলায় ২০০টি গুরুত্বপূর্ণ মন্দির রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েক ডজন মন্দিরে চুরি হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়েই পুরোহিতরা হাতে বন্দুক তুলে নিচ্ছেন। রাজ্যের রঘুনাথ মন্দিরের বিগ্রহটি বহু পুরোনো। মন্দিরের রয়েছে বহু মূল্যবান গহনা। তাই ওই মন্দিরের সম্পদ রক্ষায় বন্দুক হাতে তুলে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মন্দিরের কেয়ারটেকার দাবে রাম। তিনি আরও জানান, মন্দিরে সিসি টিভি বসানোর পর আমরা সরকারের কাছে বন্দুকের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করি। সরকার খুব সহজ শর্তে আমাদের লাইসেন্সও দিয়েছে।

জোর করে ধর্মান্তরকরণের চেষ্টা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ থানার ফটিকপুর নিবাসী সুমিত্রা প্রধানের ছোট ছেলে বলাই প্রধান (২২)। সে অবিবাহিত। তাকে তার বাবা ব্যবসা করার জন্য গ্রামেই একটি মোবাইলের দোকান করে দেন। ওখানেই গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ফরিদুল গায়েনের সঙ্গে তার আলাপ হয়। আলাপ অল্প দিনেই ঘনিষ্টতায় পরিণত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই বলাই-এর মা সুমিত্রাদেবী ছেলের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করেন। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারেন, সে মুসলিম ধর্মগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই সে বাড়ি, এমনকি গ্রাম থেকেও চলে যাবে। জানা যায়, ফরিদুল যখন তখন তার ছেলের কাছে আসত, এমনকি বলাইয়ের মোবাইল দোকানে সে রাত কাটাত। মোবাইল দোকান তল্লাশি করে ইসলাম ধর্মের কিছু বই, কাগজপত্র পাওয়া যায়।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর বলাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় এবং ফোনে তার দিদিকে বলে, সে আর কোনদিন বাড়ি ফিরবে না। মুসলিম ধর্ম নিয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। জানতে পেরে সুমিত্রাদেবী কাকদ্বীপ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। ফরিদুলই যে এই ঘটনার পাণ্ডা তা পুলিশকে জানান। পুলিশ ফরিদুলকে ডেকে আনে এবং তাকে ফোন করে বলাইকে থানায় ডাকতে বলে। সেইমত বলাই থানায় আসে। কিন্তু ফরিদুলকে থানায় ডেকে নিয়ে আসার জন্য মায়ের উপরই হম্বিতম্বি করতে শুরু করে দেয়। সে স্বেচ্ছায় মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছে বলে থানাকে জানায়। যদিও সুমিত্রাদেবীর অভিযোগ ফরিদুল কোন জঙ্গি (সম্ভবত আইএস) সংগঠনের সাহায্যে তার ছেলেকে ধর্মান্তরিত করে এবং তাকে কোন মুসলিম দেশে জঙ্গি কাজে লাগানো হবে।

কাকদ্বীপ থানা থেকে বলাইয়ের বিরুদ্ধে একটি কেস দায়ের করা হয় (কেস নং ৩৬৭/১৬)। বলাইকে কোর্টে তুললে আদালত তাকে জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

বীর শহীদদের অন্তিম সম্মান জানাতে গেলেন হিন্দু সংহতির প্রতিনিধিরা

গত ২০ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে এবং হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের যমুনা বালিয়াতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কাশ্মীরে উরি হামলায় নিহত শহীদ বিশ্বজিত ঘোড়ই এবং শহীদ গঙ্গাধর দলুই-এর শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে হিন্দু সংহতির কর্মীরা দুটি স্থানের অনুষ্ঠানেই যোগ দেয়।

গঙ্গাসাগরে হাজার হাজার গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং ''ভারতমাতা কি জয়'' ও ''পাকিস্তান মুর্দাবাদ'' শ্লোগানের মধ্যে শহীদ বিশ্বজিত ঘোড়ই-এর অন্তিম সংস্কার সম্পন্ন হয়। সংহতির রাজ্য কমিটির সদস্য রাজকুমার সরদারের নেতৃত্বে শতাধিক হিন্দু সংহতির কর্মী সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

এদিকে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে যমুনা বালিয়াতে শহীদ গঙ্গাধর দলুই-এর শেষকৃত্য হওয়ার আগে তাঁর কফিনে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সংহতির রাজ্য সহসম্পাদক শ্রী মুকুন্দ কোলে সহ সংহতির অন্যান্য কর্মীরা। শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পরে গঙ্গাধর দলুই-এর পরিবারের সাথে দেখা করে সমস্ত দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানায়। বিশ্বজিত ও গঙ্গাধরের পরিবারের সবসময় পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ।

কালিয়াচক থানা পোড়ানোর অভিযুক্ত আর্সাদুল বিশ্বাসকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গ্রেফতার করা হল

অবশেষে কালিয়াচক থানা পোড়ানো, আফিম চাষ করা সহ একাধিক মামলায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা আর্সাদুল বিশ্বাসকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গ্রেফতার করলো জেলা পুলিশ। তাকে মালদা জেলা আদালতে তোলা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে চলতি বছরে কালিয়াচকে থানা পোড়ানো, আফিম চাষে মদত দেওয়া, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাসে মদত দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। একসময় এই আর্সাদুল ছিল জেলা সিপিএমের অন্যতম মুখ। সিপিএম নেতা বিশ্বানাথ ঘোষের ঘনিষ্ঠ এই আর্সাদুল ও তার দলবল রাজ্যে পট পরিবর্তনের পর সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেয়। এরপর থেকেই সে তৃণমূল নেতা আবু নাসের খান চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ হয়। গত বিধানসভা নির্বাচনে আবু নাসের খান চৌধুরীর ডান হাত ছিল সে। তার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে একাধিক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেনি। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যে ধরপাকড় অভিযান শুরু হয়েছে, তাতেই গ্রেফতার হল এই তৃণমূল নেতা। তার বিরুদ্ধে তদন্ত চালু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে।

মন্দির অপবিত্র করার যোগ্য জবাব দিল স্থানীয় মানুষ

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত বেগমপুর গ্রামে মুসলিম দুষ্কৃতিরা মন্দির অপবিত্র করলে স্থানীয় মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের মারধোর করে।

সূত্রের খবর, ঐদিন স্থানীয় রক্ষাকালী মন্দিরের বেদীতে বসে তিনজন মুসলিম যুবক মদ খাচ্ছিল। মদ খাওয়ার পর মন্দিরের বেদীতেই তারা বোতলগুলি ভাঙে। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজনেরা মন্দিরে এলে মুসলিম যুবকেরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ক্ষিপ্ত জনতা ধাওয়া করে রেলগেটের কাছে তাদের ধরে এবং বেধড়ক মারধোর করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চন্ডীতলা থানার পুলিশ আসে। সাধারণ মানুষ পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এবং দুষ্কৃতিদের গ্রেফতার করার জন্য দাবি করে। জনতার অভিযোগে শেখ মিনাজ (পিতা-শেখ কালাম) কে গ্রেফতার করে পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ শেখ মিনাজের বাড়ি সাহানা পশ্চিমপাড়ায়, হিন্দুদের ধর্মে আঘাত করতেই সে এমন কাজ করেছে। মিনাজের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয় (৪৪২/১৬)। তার বিরুদ্ধে ৩৪১, ১৫৩এ, ৩৫৪, ৪২৭, ৫০৬ ও ৩৪ আইপিসি ধারায় কেস দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সে জেলে আছে।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

বাংলাদেশী মুসলিমদের দখলমুক্ত করতে গিয়ে কাজিরাঙা অগ্নিগর্ভ ঃ নিহত ২

জবরদখলকারী বাংলাদেশী মুসলিমদের উচ্ছেদ ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল আসামের কাজিরাঙা। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হল দু'জনের। জখম প্রায় তিরিশ জন। কাজিরাঙা লাগোয়া বান্দরডুবি, দেওচুর চাঙ ও পালখোয়া গ্রামে জবরদখলকারীদের ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। সকাল থেকে পোষা হাতি, জেসিবি, রোলার নিয়ে বনবিভাগ উচ্ছেদ শুরু করে। ৩৮১টি পরিবারের বাড়ি ভাঙা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জিনিসপত্র নিয়ে সরে গেলেও বান্দরডুবিতে বহিরাগতদের সঙ্গে স্থানীয় বিক্ষোভকারীরা রাস্তা আটকায়। পুলিশের দিকে ইট-পাথর ছোঁড়া হয়। পুলিশ লাঠি চালায়। কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ছোঁড়ে। পরে বিক্ষোভকারীরা পিছিয়ে গেলে ঘটনাস্থলে আঞ্জুনা খাতুন (১৬) ও ফকরুদ্দিন (২৬) নামে দু'জনের মৃতদেহ মেলে। ১৪ জন পুলিশকর্মী সহ অনেকে জখম হন। বিক্ষোভকারীরা অ্যাম্বুল্যান্স থেকে মৃতদেহ নামিয়ে পথ অবরোধ শুরু করে। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশের গুলিতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ডিআইজি অখিলেশ সিংহ জানান, পুলিশ রাবার বুলেট ব্যবহার করেছে। মৃতদের দেহে গুলির ক্ষত নেই।

ওই ঘটনার জেরে জরুরি বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। মৃত্যুর ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে তিনি নিহতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। শিল্প ও পরিবহণমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি জানান, জমির প্রকৃত মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু জবরদখলকারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় না। শিল্পমন্ত্রী আরও জানান, ময়না তদন্তে দু'জনের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে, কিন্তু উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় আপোস করা হবে না। প্ররোচনাদাতাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

কাশ্মীরে জঙ্গি আক্রমণের প্রতিবাদে মিছিল হিন্দু সংহতির

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর কাশ্মীরের উরি সেক্টরের সেনা ছাউনিতে অতর্কিতে হামলা চালায় পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠীর আত্মঘাতী জঙ্গিরা। ঘটনাস্থলে ১৭ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়। পরে আরও এক জওয়ানের মৃত্যু হয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮। ঘটনার আকস্মিকতা সামাল দিয়ে ভারতীয় জওয়ানরা পাল্টা দিলে চার আত্মঘাতী জঙ্গিরই মৃত্যু হয়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভারতবাসীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ক্ষোভে ফেটে পড়ে দেশের সাধারণ মানুষ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক বড় অংশের মতো সাধারণ ভারতবাসীও চাইছে এই ঘটনার উচিৎ শিক্ষা পাকিস্তানকে দিতে।

হিন্দু সংহতির সাঁকরাইল শাখার কর্মীরা পাকিস্তানের এই বর্বোরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে গত ২৫শে সেপ্টেম্বর এক প্রতিবাদ মিছিল বের করে। সেখানে পাকিস্তান মুর্দাবাদ, জোদীরা দূর হটো, এই হামলার প্রতিশোধ নিতে হবে প্রভৃতি স্লোগান ওঠে। প্রায় কয়েকশো মানুষ নিয়ে সকাল ১০ টার সময় মিছিল সাঁকরাইল থেকে বের হয়। উল্লেখ্য, সাধারণ মানুষ ও এই মিছিলকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসে। মিছিল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আন্দুল রোডে এসে শেষ হয়। সেখানে সংহতি কর্মীরা পাকিস্তানের পতাকা ও নওয়াজ শরিফের কুশপুতুল দাহ করে। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে সুন্দরগোপাল দাস, মুকুন্দ কোলে সমস্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সহদেব থান্ডারের নেতৃত্বে বিশ্বজিৎ, বাপ্পা, কিশোররা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে।

নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার নামখানাতে

দঃ ২৪ পরগণা জেলার নামখানা ব্লকের অন্তর্গত দ্বারিকনগর গ্রামের মেয়ে আশা গায়েন (নাম পরিবর্তিত, পিতা-অশোক) গত ২৭শে আগস্ট বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। সে স্থানীয় শিবানী মন্ডল মহাবিদ্যালয় বি.এ. প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিল। পরিবারের লোক খোঁজখবর করে জানতে পারে যে সে আলমগীর শেখ (পিতা-নবাবউল সেখ) নামক এক ব্যক্তি তাকে নিয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, আলমগীর শেখ মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি ব্লকের আহিরন গ্রামের বাসিন্দা। সে মেয়েটির আশেপাশের গ্রামে রাজমিস্ত্রীর কাজ করত। পরে পরিবারের লোক থানায় অভিযোগ জানালে থানা দ্রুততার সঙ্গে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। মেয়েটি নাবালিকা হওয়ায় বর্তমানে হোমে আছে। এক্ষেত্রে নামখানা পুলিশের ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

বাংলাদেশের শ্রীমঙ্গলে সাঁওতাল পাড়ায় দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর

গত ৭ই সেপ্টেম্বর ভোরে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল শহর সংলগ্ন বুরবুড়িয়া চা বাগানে সাঁওতাল পাড়ার সার্বজনীন পূজামণ্ডপে নির্মাণাধীন কাঠামোর গণেশ, লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিক ও অসুরের মূর্তি ভাঙচুর করে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতিরা। বুধবার বিকেলে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, সাঁওতাল পাড়ার সার্বজনীন পূজামণ্ডপে মূর্তি নির্মাণ কাজ সবে শুরু হয়েছে। অর্ধনির্মিত অবস্থায় রয়েছে কাঠামো গুলো। এর মধ্যে দেখা যায় গণেশ দেবতার হাতে ইট দিয়ে ঢিল মারার দাগ এবং একটি কান ভাঙা। এ ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি মূর্তির আংশিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। পূজা আয়োজন কমিটির কানু সাঁওতাল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দ্বিতীয়বার এই ধরণের

ঘটনা ঘটলে তা বরদাস্ত করা হবে না। এ বিষয়ে তারা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কাফের-মুশরেক হত্যা করলে আল্লাহ'র নৈকট্য লাভের সুযোগ পাবে

বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে ডিবি পুলিশের হাতে আটক জেএমবি'র আত্মঘাতী শাখার চার নারী সদস্যের মধ্যে তিনজন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে জানিয়েছে যে জেএমবি'র পলাতক নেতা ফরিদুল তাদের বলেছে, 'আত্মঘাতী হামলার মাধ্যমে কাফের-মুশরেক হত্যা করলে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ পাবে।' সিরাজগঞ্জের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নজরুল ইসলামের আদালতে ওই তিন নারী ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেয়। স্বীকারোক্তিতে তারা নিজেদের জেএমবির আত্মঘাতী শাখার সদস্য বলেও পরিচয় দেয়। তারা জানায়, বগুড়ার শেরপুরের কুঠিবাড়িতে সম্প্রতি বোমা বিস্ফোরণে নিহত সিরাজগঞ্জের জামুয়া গ্রামের জঙ্গি নেতা তরিকুল ইসলাম ও কাজিপুর উপজেলার বরইতলা গ্রামের ফেরার জেএমবি নেতা ফরিদুল ইসলামের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ ঘোষিত জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)'র আত্মঘাতী শাখার সদস্য হিসাবে তারা কাজ করছে।

জেলা পুলিশ সুপার জানান, 'সিরাজগঞ্জে গত বছরে নিষিদ্ধ ঘোষিত জামাতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)'র ২১ জন সদস্য পুলিশের কাছে ধরা পড়েছে। তাদের মধ্যে ৮ জন নারী সদস্য। এই ৮ জনের মধ্যে ৪ জন আত্মঘাতী শাখার সদস্য।' তিন নারীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে পুলিশ সুপার জানান, 'জঙ্গি তারিকুলই ছিল এদের মূল হোতা। তার প্ররোচনায় এরা সিরাজগঞ্জে জঙ্গি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। তারিকুল ও তার ভাগিনা রায়হানের প্ররোচনায় কাজিপুর

উপজেলার বরইতলা গ্রামের ফরিদুল ইসলাম প্রথমে জেএমবিতে যোগ দেয়। পরে ফরিদুলের মা ফুলেরা বেগম, বোন শাকিলা ও সালমা খাতুন এবং প্রতিবেশী রফিকুলের স্ত্রী রাজিয়া খাতুনসহ অন্যান্যরা জেএমবি'র আত্মগাতী শাখায় যোগ দেয়।' পুলিশ সুপার আরও বলেন, 'তারিকুল মৃত্যুর আগে তার ভাগিনাসহ বরইতলা গ্রামে এসে ফরিদুল ও তার বোনদের সাথে জেএমবির সাংগঠনিক বিষয় নিয়েও গোপন বৈঠক করে। ফরিদুলের মা-বাবা জেনে শুনে ছেলে-মেয়েদের প্রশ্রয় দিয়েছেন। তারিকুল নিহত হওয়ার পর পুলিশ তার ভাগিনা রায়হানসহ পরিবারের বেশ ক'জনকে গ্রেফতার করেছে। তারা এখন বগুড়ার কারাগারে রয়েছে। তারিকুল ও ফরিদুল সিরাজগঞ্জে জঙ্গি নেটওয়ার্কের কাণ্ডারি ছিল, যা আগে আমরা জানতে পারিনি। সম্প্রতি বগুড়ার শেরপুরে বোমা বিস্ফোরণে তারিকুল নিহত হওয়ার পর তাদের কর্মকান্ড পুলিশের নজরদারিতে আসে। এর মধ্যেই ফরিদুল গা ঢাকা দেয়। বর্তমানে সে পলাতক।'

পত্রিকা দপ্তর থেকে

খুনের ঘটনা ঘিরে দুষ্কৃতিরা তান্ডব চালাল ঢোলা থানায়

গত ৫ই সেপ্টেম্বর ঢোলা থানার অন্তর্গত দড়িকৌতলা গ্রামের রউফ লস্কর (২৬) খুন হয়। গ্রাম থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে লক্ষী নারায়ণপুরে এক পুকুরের পাশে তার ক্ষত বিক্ষত দেহ পাওয়া যায়। সে হাটে গরু ছাগল কেনাবেচা করত। ভাজিনার হিন্দুরা এই কাজ করেছে বলে এলাকার মুসলমানরা জুমাই লস্কর বাজার থেকে লক্ষীকান্তপুর পর্যন্ত রাস্তা দীর্ঘক্ষণ অবরোধ করে। রবীন্দ্রনাথ বৈদ্য (৪০) নামক সরকারী পিয়নকে লক্ষ্মীনারায়ণপুরের মুসলমানরা ব্যাপক মারধোর করে। চিঠিপত্র ও তার বাইকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ বৈদ্যর আঘাত গুরুতর। তাকে ডায়মন্ডহারবারে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অমল হালদার (৩০), শিরীষ মন্ডল (৬৫) ও অনন্ত হালদারকে মুসলমানরা মারধোর করে বলে অভিযোগ।

পরদিন মুসলমানরা ঘোষণা করে যে, ভাজিনা, রামচন্দ্রপুর, বেনেপাড়া ও দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর গ্রামের কাউকে হাটে দোকান খুলতে দেওয়া হবে না। ভয়ে এইসব গ্রামের ব্যবসায়ীরা পরদিন কেদো হসপিটাল রোডের হাটে দোকান খুলতে পারেনি। এমনকি জুমাই লস্কর বাজারেও এইসব গ্রামের হিন্দু ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। বেদশ্রুতি মন্ডল (৪৫) যিনি আগে বেনেপাড়ায় থাকতেন বর্তমানে ডায়মন্ডহারবারে থাকেন, তিনি তার সারের দোকান খুললে মুসলমানরা প্রচন্ড মারধোর করে। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেয়। প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানান, ঢোলা অঞ্চলের টিএমসি মেম্বার মুজ্জাফর পেয়াদার নেতৃত্বে প্রায় ৪০ জন মুসলিম গুন্ডা হাটে এই তান্ডব চালায়। ক্ষুব্ধ ভাজিনার এক ব্যবসাদার জানান, এ সবই মুসলমানদের ষড়যন্ত্র। এই খুনের সঙ্গে ভাজিনার কেউ জড়িত নয়।

১১ই সেপ্টেম্বর ঢোলা থানার প্রায় পাঁচ হাজার মুসলিম বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে ঢোলা থানা ঘেরাও করে এবং তারা থানা আক্রমণ করে ভাঙচুরের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়িয়ে দেয়। পুলিশের গাড়িতে তারা অগ্নিসংযোগ করে বলে অভিযোগ। প্রথমদিকে বিক্ষোভকারীদের হাত থেকে বাঁচতে থানার পুলিশ দোতলায় আশ্রয় নেয়। অনেকে থানা ছেড়ে পালিয়েও যান। সন্ধ্যে নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগণার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) চন্দ্রশেখর বর্ধন, ডায়মন্ডহারবার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) রূপান্তর সেনগুপ্ত কাকদ্বীপের এসডিপিও অশেষ বিক্রম দস্তিদার ও কয়েকটি থানার ওসিকে নিয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। র‍্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স নামানো হয়। এই সময়ে উত্তেজিত জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁট ছুঁড়তে থাকে। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে প্রথমে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায় পুলিশ। এতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে বাধ্য হয়ে পুলিশকে কয়েক রাউন্ড গুলি চালাতে হয়। গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছে পাঁচ বিক্ষোভকারী। এছাড়াও অল্পবিস্তর আহত হয়েছে অনেকে। এলাকায় পুলিশ বাহিনী, র‍্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। রাত পর্যন্ত ৩৯ জনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার সাধারণ মানুষের আইন হাতে তুলে নেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ বলেন, পশ্চিমবঙ্গে জেহাদী আক্রমণের পরিকল্পনা চলছে। এই ঘটনা তার মহড়া মাত্র। তিনি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন পশ্চিমবঙ্গবাসী এর বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান।

হত্যার প্রতিবাদে উত্তাল খড়গপুর

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক সাড়ে আটটা নাগাদ বন্ধুকে বাইকে করে ছেড়ে দিয়ে রোহিত তাঁতী (পিতা-রাজেশ তাঁতী) বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ক্ষণিকের ভুলে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে সে। ব্যক্তিটির আঘাত গুরুতর ছিল না। উভয়ের মধ্যে একটা সমঝোতাও হয়ে যায়। কিন্তু আহত ব্যক্তিটি ছিল মুসলিম। ফলত পাশের মসজিদ থেকে চার-পাঁচটি ছেলে এসে রোহিতকে মারতে শুরু করে। বুকে গুরুতর আঘাত নিয়ে রোহিত মাটিতে পড়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাকে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন।

খটিক সম্প্রদায়ের রোহিতের মৃত্যুর খবর পাড়ায় যেতে সেখানকার লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নামলে মুসলমানরা তাদের আক্রমণ করে। উভয় পক্ষের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। বেশ কয়েকটি মুসলমানের দোকানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয় বলে সূত্রের খবর। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে। হিন্দুদের সাতজন এবং মুসলমানদের কুড়ি-বাইশ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদের সকলের বিরুদ্ধে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি কেস দায়ের করা হয়েছে।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

উরি সেক্টরেই জবাব দিলো ভারতীয় সেনা, দিনভর সংঘর্ষে হত ১০ জঙ্গি

ফের সন্ত্রাসবাদী হানা উরিতে। কিন্তু এবার প্রবল প্রত্যাঘাত ভারতীয় সেনার। ২০ই সেপ্টেম্বর সকাল থেকে আক্রান্ত উরি সেক্টরেই শুরু হয় সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত ১০ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। রবিবার ভোরেই উরিতে সেনা ব্রিগেডের সদর দফতর আক্রান্ত হয়েছিল। পকিস্তান থেকে আসা আত্মঘাতী জঙ্গিদের হামলায় ১৮ জওয়ানের মৃত্যু হয় উরি সেনা ছাউনিতে। সেনার পাল্টা অভিযানে চার আত্মঘাতী জঙ্গি খতমও হয়। কিন্তু সেই ঘটনার পর ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আজ, ফের জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা হল সেখানে। সেনা সূত্রের খবর, এদিন যে ভাবে জঙ্গিরা নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে, তা সাম্প্রতিক অতীতে নজিরবিহীন। অন্তত ১৫ জন সন্ত্রাসবাদীকে এ দিন নিয়ন্ত্রণ রেখার এপারে ঢোকানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু পাল্টা প্রত্যাঘাতের জন্য পুরোদস্তুর প্রস্তুত ছিল ভারতীয় বাহিনী। ফলে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর সেনাবাহিনীর সঙ্গে এদিন তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে জঙ্গিদের। উরি সেক্টরের লাছিপুরা এলাকা থেকেই সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষের খবর এসেছে। ওই এলাকা দিয়েই মূলত অনুপ্রবেশের চেষ্টা হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। লছিপুরায় ভারতীয় বাহিনী তীব্র প্রত্যাঘাত করেছে বলে প্রথম খবর পাওয়া যায় আজ বিকেল চারটে নাগাদ। অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতে গিয়ে পাঁচ জঙ্গি সেনার গুলিতে নিহত হয়েছে বলে জানা যায়। তার আধ ঘন্টার মধ্যেই ফের বড় সাফল্যের

কথা জানায় সেনাবাহিনী। লছিপুরায় গুলির লড়াইতে আরও তিন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আরও ২ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর আসে। সেনাবাহিনীর দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, ১৫ জন জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল, তাদের মধ্যে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাকিরা অনুপ্রবেশে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে।

একই দিনে ১৫ জনকে নিয়ন্ত্রণ রেখা পার করানোর চেষ্টাকে বড় ঘটনা হিসেবেই দেখছে দেশের নিরাপত্তা বাহিনী। জম্মু-কাশ্মীরে উত্তেজনা চরমে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই অনুপ্রবেশের এই মরিয়া চেষ্টা বলে ভারত সরকার মনে করছে। লছিপুরা সহ উরি সেক্টরের বিভিন্ন এলাকায় সেনা চিরুনি তল্লাশিতে নেমেছে। সন্ধ্যা নাগাদ হান্দওয়ারাতেও সেনা জঙ্গি গুলির লড়াই শুরু হয়েছে বলে খবর। সংঘর্ষে এক জওয়ান জখম হয়েছেন।

ব্লকে ব্লকে হিন্দু সংহতির কর্মী মিটিং

গত এক মাস ধরে জেলায় জেলায় বৈঠক চলছে হিন্দু সংহতির। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে পাঁচটা থানার কর্মীদের নিয়ে বৈঠক হয় গত ১১ই সেপ্টেম্বর, রবিবার। জয়নগর, রায়দিঘি, মথুরাপুর, মন্দিরবাজার ও কুলতলির কর্মীরা এই বৈঠকে এসেছিল। বৈঠকের মূল বিষয় ছিল- এলাকার পরিস্থিতি, মেম্বারশিপ, সংহতি সংবাদ ও পূজায় বিভিন্ন জায়গায় স্টল লাগানো ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সতর্ক থাকা। সংগঠনের সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য্য কর্মীদের মূল লক্ষ্য ও কাজ সম্বন্ধে সচেতন করে দেন। সুজিত মাইতি, দেবদত্ত মাজি, পীযুষ মন্ডল, রাজকুমার সরদার ও ভগবতী হালদার উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর আন্দুল সাঁকরাইল অঞ্চলের কর্মীরা আড়গোড় অঞ্চলে ক্ষুদিরাম স্মৃতি সংঘ ক্লাবঘরে বৈঠক করে। প্রায় ৬০ জন কর্মী বৈঠকে উপস্থিত ছিল। সেখানে আন্দুল অঞ্চলের প্রমুখ কর্মী রাম মজুমদার, বিশ্বজিৎ সাঁধুখা ও শ্রীমন্ত দেবনাথ বক্তব্য রাখেন। এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

গত ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষের উত্তরবঙ্গ সফর হয়। ২৪ তারিখ মালদার গাজোলে অন্নদাশঙ্কর হলে একটি কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রায় ২৫০ কর্মী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ২৫ তারিখ চোপড়ায় একটি কর্মী সভা হয়। সেখানে প্রায় ৫০ জন সংহতি কর্মী উপস্থিত ছিলেন। উভয় স্থানেই সুজিত মাইতি, পীযূষ মন্ডল ও জিতেন্দ্র চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

আমার ঠাকুর

আমার ঠাকুর অস্ত্রধারী।
আমার ঠাকুর যোদ্ধা।।

দুর্বলেরা হিন্দু না
হতেও পারে বোদ্ধা।
আমার ঠাকুর যুদ্ধ করে—
পুরুষ হোক বা নারী।

আমি হিন্দু, এমনিতে তাই—
যোদ্ধা হতে পারি।

আমি হিন্দু – রক্তবিন্দু
ভগবানের দান।
আমার লক্ষ্য—
অসুর মুক্ত আমার হিন্দুস্থান।।

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686

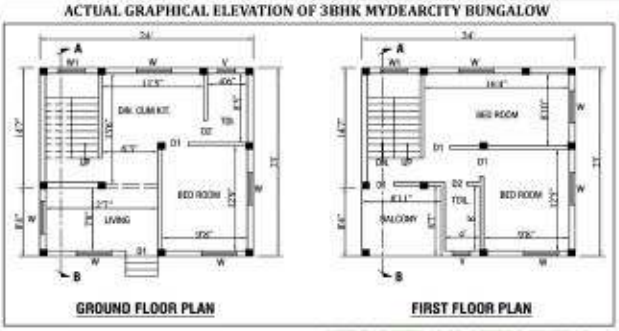

With Best Compliments from :-

হিন্দু সংহতি ঃ আমাদের সংকল্প

- হিন্দুস্থানের কোন জায়গা থেকে হিন্দুদের স্থানচ্যুত হতে দেব না।
- হিন্দুর উপর অন্যায়, অত্যাচার ও অপমান মেনে নেব না।
- হিন্দু মা-বোনের সম্মান প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব।
- হিন্দু বোনদের আমাদের ধর্মের বাইরে হারিয়ে যেতে দেব না।
- আমাদের দেব-দেবী ও মন্দির প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব।
- হিন্দুর জনসংখ্যা কমতে দেব না।
- বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দেব না।
- হিন্দু সমাজে জাতপাত ভেদাভেদ মানব না।

মূল্য ঃ ১৬.০০ টাকা মাত্র